ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র

যোগেন্দ্রনাথ সরকার

মিত্রালয়
॥ ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥

দ্বিতীয় সংস্করণ

॥ আড়াই টাকা ॥

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে জি, ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪১ অনাথনাথ দেব লেন, কলিকাতা-৩৭ হইতে সুধীরকুমার বসু কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের কথা

প্রথম সংস্করণে 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' 'নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত' শিরোনাম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল (বাং ১৩৪৭)। উক্ত সংস্করণে বই-এর মলাটে বা নামপত্রে লেখকের নাম না থাকায় গ্রন্থের মূল লেখকের নাম খুঁজে পাওয়া সাধারণ পাঠকের কাছে সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। অবশ্য ভূমিকার মধ্যে সম্পাদক মশাই লিখেছিলেন—"…১৩৩২ সালের শেষভাগে রেঙ্গুন হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার নামক একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আমায় পত্রদ্বারা জানান যে, যদি আমার সম্পাদিত "বাঁশরী" পত্রিকায় ছাপিতে রাজি হই, তাহা হইলে তিনি শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম-প্রবাস কালের চিত্তাকর্ষক বিবরণ ধারাবাহিকভাবে লিখিয়া পাঠাইতে পারেন।…"তারপর ১৩৩৩ সাল থেকে বিভিন্ন কিস্তীতে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম দেশে বসবাসের এই বিবরণটি 'বাঁশরী'তে প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৪৭ সালে এই বিবরণীকে গ্রন্থরূপে প্রকাশের কালে সম্পাদক মশাই লেখককে কোণঠাসা করে আত্মনাম প্রচারের যে নির্লজ্জতা দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর বই কি! সম্পাদনার নীতি বা শোভনতার ইতিহাসে এমন বিচিত্র নিদর্শন দুর্লভ!

পরবর্তীকালে যোগেনবাবুর বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী হরিমতী দেবী এই গ্রন্থের কপিরাইটের দাবিতে প্রথম সংস্করণের সম্পাদক এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ হাজির করেন (ইং ১৯৪৩ সাল)। ফরিদপুর জেলা জজের রায়ে এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারে হরিমতী দেবীর অধিকার সাব্যস্ত হয়। এরপর অবশ্য গ্রন্থখানি দীর্ঘদিন বাজারে অনুপস্থিত থাকে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহায়তায় বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ ঘটে গেল।

'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন শরৎচন্দ্রের জীবন বা সাহিত্য-সম্পর্কে বিশেষ কোনো বই বাজারে আত্মপ্রকাশ করে নি। বস্তুতঃ হালফিল শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তির উপর উত্তরোত্তর গবেষণাদি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

যোগেনবাবু রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একই অফিসে কেরাণীগিরি করতেন এবং যোগেনবাবুর কলাপ্রীতিই তাঁকে শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গজন করে তুলেছিল। সে যুগে রেঙ্গুনের বাঙালীমহলে শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যিক হিসেবে খুব কম লোকেই জানত। এবং এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের আত্মগোপনের চেষ্টাই ছিল বেশী। একান্ত আত্মজন বলতে যে দু-একজন স্নেহভাজন সহকর্মীর সঙ্গে তিনি চিত্রকলা, সঙ্গীত বা সাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন কেবলমাত্র সেই মুষ্টিমেয় বাঙালীই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার খবর রাখতেন। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের যৌবনের অনেক বছর প্রায়-অজ্ঞাতবাসে কেটেছে। সেই অজ্ঞাতপ্রায় কয়েক বছরের কিছু কিছু তথ্য যোগেন্দ্রবাবুর স্মৃতিকথায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই দিক দিয়ে 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্রে'র প্রামাণিকতা পরীক্ষিত—কেন না শরৎচন্দ্রের জীবনকালেই এই বিবরণী প্রকাশিত হয় এবং শরৎচন্দ্র এর সত্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় প্রকাশ করেন নি। ঐতিহাসিক মর্যাদার দিক দিয়ে এই বইখানি স্বতন্ত্র গুরুত্ব বহন করে বলেই এর পুনর্মুদ্রণ করা হল।

॥ চৈত্র, ১৩৬৫ সাল ॥

।। এক ।।

এমন একদিন ছিল, যেদিন এই বিদেশে শরৎচন্দ্র আমাদেরই মত একজন অধম কেরাণী ছিলেন এবং এই রেঙ্গুনের বাঙ্গালী সমাজে তিনি একজন গায়ক বলিয়াই শুধু পরিচিত ছিলেন। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগেই হোক কিংবা ১৯০৬-এর প্রথম ভাগেই হোক, শরৎবাবুর সহিত আমার পরিচয় হয় কর্ম্মসূত্রে একই অফিসে। এই অফিসে আর একটী বন্ধু জুটিয়াছিলেন, তিনি এখন পরলোকে। তাঁহারও একটু আধটু সঙ্গীতে অধিকার ছিল, তাঁহারই প্রসাদে জানিতে পারিলাম শরৎবাবু সুগায়ক।

অপর একটি বন্ধু দীর্ঘকাল এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার হিন্দী ভাষায় যথেষ্ট দখল জন্মিয়াছিল। সেই ব্যপদেশে একটুখানি সঙ্গীতেও হয়ত বা তাঁহার দখল জন্মিয়া থাকিবে। ইহার জোরে দুর্লভ সঙ্গীত বিদ্যাটাকে ইনি আমাদের মত সঙ্গীতানভিজ্ঞদের কাছে যেরূপ ভাবে জাহির করিতেন, তাহাতে মনে হইত, আঃ! কি একটা মানুষের সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছে। এই বন্ধুটীর সঙ্গে শরৎবাবুর একদম বনিবনা ছিল না। শরৎবাবুর সঙ্গীত প্রসঙ্গে ইনি প্রায়ই বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, —ওঃ! ভারী ত গাইয়ে! 'তাল' কাকে বলে, সেই জ্ঞানই যার আদবে নেই, সে আবার গাইয়ে কিসের?

বন্ধু, সুর-লয়, রাগ-রাগিণী, গমক-গিটকিরি, মূর্চ্ছনা প্রভৃতির এমন সব আলোচনা করিতেন, যাহা আমাদের কাছে একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিত। তাঁহার এই দুর্লভ বিদ্যাটা আমাদের মত যণ্ডামার্কদের পাল্লায় পড়িয়া অচিরেই

ধামা-চাপা পড়িবার জোগাড় হইল। ঝোঁক পড়িল আমাদের শরৎচন্দ্রের উপর। শীর্ণ রুগ্ন মলিন চেহারার এই লোকটির যে এমন সুকণ্ঠ, ইহাতে মনে হইত যে, বিধাতার বিচারে এতটুকুও ভুল নাই। এই শুষ্ক শীর্ণ দেহের ভিতরে তিনি যে মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সুর, এই সঙ্গীত তাহারই লীলায়িত গতি-প্রবাহের শব্দ মাত্র।

শরৎচন্দ্র চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য ও সঙ্গীতের পক্ষপাতী ছিলেন। একবার রেঙ্গুনবাসী বাঙ্গালীরা মিলিয়া স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্রকে এই সহরে অভ্যর্থনা করেন। সেই অভ্যর্থনা সভায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় হয়, তখন তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ওহে সে ছোকরাটি কোথায় থাকে হে? রবির গান সে বড় চমৎকার গায়।' কিন্তু ছোকরাটিকে বহুবার অনুরোধ করিয়াও নবীনচন্দ্রের সদনে লইয়া যাইতে সক্ষম হই নাই।

আমার সেই পরোলোকগত বন্ধুটী যাঁহার কৃপায় শরৎচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তিনি আমাকে খুড়ো সম্বোধন করিতেন। একদিন আমাকে বলিলেন, 'চল খুড়ো, আজ শরৎদার গান হবে শুনে আসি।'

রেঙ্গুনে তখন একমাত্র 'বেঙ্গল সোস্যাল ক্লাব' ছিল বাঙ্গালীর মিলন-কেন্দ্র। প্রায়ই সেখানে গীত-বাদ্যের অনুষ্ঠান হইত। দুই একজন সুর-লয়ের ওস্তাদ সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বহুক্ষণ ধরিয়া তবলা তানপুরার সঙ্গে নানারকম সুরের কসরৎ দেখাইয়াও লোকজনকে তেমন তৃপ্তিদান করিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না।

সেইদিনকার গানের মজলিসে গান হয়ত সুরে-লয়ে জমিয়াই উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের মত দুই-চারিজন অরসিকের কাছে কিছুই যেন ভাল লাগিতেছিল না। বন্ধুকে বলিলাম, 'না হে খুড়ো, আর ত ভাল লাগছে না—চল

এইবার সয়ে পড়া যাক। বলে এলে তোমার শরৎদার গান হবে। শরৎবাবু দেখছি কেমন মুষড়ে গেছেন।'

এইবার খুড়ো আমার কথার চোটে শরৎদাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল। শরৎবাবুর ত অসংখ্য ওজর আপত্তি।—'ওহে আজ থাক, আরেকদিন হবে। আজ যে পর্ব্ব চলেছে চলুক, অন্য রকম সুরু করলে লোকজন সব চটে যাবে।'

খুড়ো সকলের সামনে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে বলিলেন, 'এবার আপনারা দয়া করে দু-একখানা বাংলা গান বোধ হয় শুনতে রাজি হবেন।'—বলিতেই সকলে প্রায় একবাক্যে ইহা সমর্থন করিল।

তবলার ওস্তাদ দাদামহাশয়ের শীর্ষস্থ সূক্ষ্ম শিখাটী অবিরাম মস্তকান্দোলনের জন্য গ্রন্থিচ্যুত হইয়া গিয়াছিল! এইবার সেটিকে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া বাঁয়া তবলা হাতে করিয়া তড়াক করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। অমনি চারিদিক থেকে সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, 'কি করেন দাদামশায়? একটুখানি বসুনই না হয়।'

আর দাদামশাই! কাহারো অনুরোধ-উপরোধের ধার দিয়াও তিনি গেলেন না। দপ দপ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। যাইবার সময় সকলকে শুনাইয়া বলিয়া গেলেন—'এখন তোমাদের—'আয় না অলি কুসুম তুলি'—হোক্ ভায়া এখন আর আমাকে কেন?' বলিয়াই নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। বাকি এখন রহিলেন শরৎবাবু, আর রহিলাম আমরা।

শরৎবাবু যে গান ধরিলেন, দেখিলাম, সে ত 'আয় না অলি কুসুম তুলি'র ধার দিয়াও গেল না। প্রথমেই ধরিলেন জ্ঞানদাসের সেই বিখ্যাত পদ—'তোমারি গরবে গরবিণী রাই, রূপসী তোমারি রূপে'। মরি মরি মরি! বাংলা গানে যদি প্রাণ থাকে ত এই সব মহাজনদিগের পদেই আছে, আবার বাঙ্গালীর প্রাণেও যদি সত্যকার গান থাকে ত সেও এই বৈষ্ণব গানই। শরৎচন্দ্র যে কি গাহিলেন, বলিতে পারি না। দেখিলাম তাঁহার চোখ দু'টী ছল ছল করিতেছে—রুগ্ন শীর্ণ কণ্ঠ যেন সঙ্গীতের ভারে ফাটিয়া পড়িতেছে। কি সে প্রাণের বেদনা। কি সে মর্ম্মের ক্রন্দন! সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আসিয়া সকলের

মর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে। গান বলিতে যদি কিছু থাকে, যাহার ভিতরে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, সে এই গান, এই প্রাণ-জুড়ানো সঙ্গীত।)

সেই হইতে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতের ভক্ত হইয়া পড়িলাম এবং ওস্তাদ-দিগকে সঙ্গীতের আসর হইতে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

শরৎবাবু এখানে তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের বাসায় থাকিতেন। সেই আত্মীয়টির দেহান্তর ঘটিলে, কিছুদিন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেসে থাকিতে বাধ্য হন। যখন আমাদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে তখন খুড়ো প্রমুখ বন্ধুবান্ধব-সহ আমরা সকলেই 'একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস একাউণ্টস' অফিসের কেরাণী। পূর্বোক্ত দাদামহাশয় এবং হিন্দুস্থানীদের দেশ-ফেরত সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধুটীও আমাদের অফিসে। শরৎবাবু কোথায় যেন পেগু না টঙ্গুতে চাকরী করিতে গিয়াছিলেন, হঠাৎ একদিন আমাদের মাঝখানে লম্বা লম্বা চুল ও দাড়ি লইয়া তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চেহারার তাঁর গায়ে একটা আলখাল্লা হইলেই ঠিক মানাইত। কেহ কেহ রগড় করিতেও ছাড়িল না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বাউলের বেশ ত ঠিকই হয়েছে, এবার একটা গুপী যন্তর-টন্তর নিয়ে শ্রীহরি বলে বেরিয়ে পড়ুন। যে গলা, কোন ভাবনা নেই।')

দাদামশায় দন্তহীন মুখে হো হো শব্দে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্রের যে কোন দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক বেশী ছিল তাহা আমরা কেহই প্রথমটায় ধরিতে পারি নাই। তবে গায়ক বলিয়া যা কিছু খ্যাতি ছিল, সেটাও তাঁর নিজের দোষেই অবশেষে মাটি হইতে বসিল। কোন গান আরম্ভ হইলে শেষ পর্যন্ত সেটি গাহিবার ধৈর্য তাঁর প্রায়ই থাকিত না। আরব্ধ গানের মাঝখানে হঠাৎ হারমোনিয়াম ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতেন। অমনি চারিদিক হইতে অনুরোধের পর অনুরোধ—'কি হে শরৎদা? একি করলে? ঘাটে এসে ভরাডুবি? অন্যগান না গাও এখানাই অন্ততঃ শেষ করে যাও!'—আর

শরৎদা? ততক্ষণে তিনি সিঁড়ি বহিয়া রাস্তায় নামিয়া গিয়াছেন।

আমার খুড়োটী ছিল শরৎদার নামে পাগল, তিনি কখনও কখনও তাঁহার পায়ে পর্যন্ত পড়িয়া সাধাসাধি করিতেন। শরৎদা তখন হয়ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কাহাকেও দেখাইয়া দিয়া বলিতেন, 'ওহে অমুক গাইবে।' কখনও বা আমাদেরই অপর একটী বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিতেন 'ওহে মানিক গাবে'খন।...ও চমৎকার গায়।' অগত্যা দুধের পিপাসা ঘোলে মিটাইয়া আমাদিগকে নিরস্ত থাকিতে হইত।

এইরূপে ক্রমশঃ গানের আড্ডা হইতে শরৎবাবু আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন। কেন না, গানের মজলিস একবার বসিলে আর শীঘ্র ভাঙ্গিবার নামটী নাই। ইহার উপর যদি কোন গায়কের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার গান একবার শ্রোতাদের কানে ভাল লাগিয়া যায় ত ঐ গায়কের আর দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। বন্ধুবান্ধব, এমনকি আত্মীয়স্বজন পর্যন্তও তাঁহাকে রেহাই দেন না। চালাও যত হুকুম ঐ গরীব বেচারার উপর—ইহাতে সে মরুক আর বাঁচুক।

শরৎবাবু কোনদিনই স্বাস্থ্য-সম্পদের অধিকারী ছিলেন না। অধিকক্ষণ গান গাহিতে হইলে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তাই কতকটা বাধ্য হইয়া, কতকটা বা অধ্যয়নের জন্য এইসব মজলিস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ সেদিন আমাদের ক্লাবের সম্মুখে দাদামশায়ের সঙ্গে আমাদের দেখা। দাদামশায় তাঁহার দন্ত-বিরল মুখে প্রচুর পরিমাণে মধুর হাসির ছটা বিকীর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে ভাই শরৎদা! আর এদিকটে মাড়াসনে যে!'

শরৎদাও 'প্রণাম' বলিয়া হাত দুখানি কপালে ঠেকাইয়া তেমনি হাসির ছটা বিকশিত করিয়া উত্তর দিলেন, 'কি কোরবো দাদামশাই নেহাৎ দুর্ভাগ্য তাই আসতে যেতে পারি নি।'

'দুর্ভাগ্য তোর না আমাদের বল ভাই! মিত্তির, কি বল ভাই এ সম্বন্ধে?'

বলিয়াই পার্শ্বচর মিত্র মহাশয়ের দিকে একটুখানি সকৌতুক কটাক্ষ করিলেন।

মিত্র মহাশয় যেন আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, 'বটেই ত দাদামশাই! ঠিক বলেছেন। শরৎদার যে কেন আর আমাদের এদিকটায় পায়ের ধুলো পড়ে না, তা শরৎদাই বলতে পারেন। একবার দয়া করে আমাদের ওদিকে—?'

শরৎদার হইয়া মিত্র মহাশয়ের কথার আমিই জবাব দিলাম, বলিলাম, 'নিশ্চয়ই হবে।' বলিয়াই আর বাক্যব্যয় না করিয়া শরৎদার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে একরূপ জোর করিয়াই দাদামশায়দের মেসের বাসায় লইয়া গিয়া উঠাইলাম।

বাসায় একটী সখের হারমোনিয়ম ছিল। যিনি সখ করিয়া যন্ত্রটী কিনিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষা-সোপানের প্রথম ধাপে পা দিতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। পয়সার জিনিষটা এখন ধূলাবালিতে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। শরৎবাবু যন্ত্রটীকে ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বেলো করিতেই সুমিষ্ট সুরলহরীতে ক্ষুদ্র কক্ষটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তারপর যখন তিনি কিন্নর-কণ্ঠে ধরিলেন—

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখবো বলে হে, তাই এসেছিলাম এ গোকুলে
আমায় স্থান দিয়ো রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী, তাই সেজেছি বিদেশিনী
এখন বাঁচাও রাধে কথা ক'য়ে
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
তুমি যদি না কও কথা, ফিরে যাব যমুনাকূলে।
ভাঙবো বাঁশী ত্যেজবো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙুক মান,
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
চরণ-নূপুর বেঁধে গলে,
ঝাঁপ দিব যমুনা জলে।

এই গানটী পূর্ব্বে থিয়েটারে মাতাল দেবেন দত্তের অভিনয়ে যাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনিও একজন অসাধারণ রঙ্গাভিনেতা ও কিন্নর-কণ্ঠ গায়ক। তাঁহার মুখেও গান শুনিয়াছিলাম, শরৎবাবুর মুখেও শুনিলাম। সঙ্গীত বিদ্যায় যে শরৎবাবুর অপেক্ষা তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে অধিক, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শরৎবাবুর প্রাণটী নিশ্চয়ই তাঁর প্রাণের চাইতে বড়, একথা জোর করিয়া বলা যায়। কেন না, যে গানে একদিন হাসির উদ্রেক করিয়াছিল, আজ সেই গানে হাসির পরিবর্ত্তে অনাবিল অশ্রুর ঝরণা বহাইয়া দিয়া গেল।

গানটী সমাধা হইতেই অনুরোধ উপরোধের অন্ত রহিল না। অগত্যা আরও দুই-একখানি গান তাঁহাকে গাহিতে হইল। কিন্তু সে গান অনিচ্ছা-সত্ত্বে গাহিবার দরুণই আগেরটীর মত জমিল না।

একদিন আমাকে শরৎদা বই-এর দোকানে লইয়া গিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কি কিনব বল ত ?'

মুখের পানে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিয়া কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি নিজেই বলিয়া ফেলিলেন, 'এই দেখ আজ কি কিনতে এসেছি।' বলিয়াই তিনি রং তুলি প্রভৃতি বাছাই করিতে লাগিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ আবার কি খেয়াল মাথায় ঢুকল শরৎদা ?'

'দেখ কি করে বসি এবার।'—বলিয়া তিনি গুটিতিনেক তুলি আর দু'তিন রকম রং কিনিয়া লইলেন।

আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হবে এ দিয়ে ?'

উত্তর পাইলাম, 'পরশু রবিবারে একবার আমার বাসায় গিয়ে দেখো, কি হয় এসব দিয়ে।'

রবিবারে তাঁহার বাসায় গেলাম। গিয়া দেখি, তিনি মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া যে বাড়ীতে একাকী অবস্থানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সে বাড়ীটি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও একলার পক্ষে যথেষ্ট। ক্ষুদ্র গৃহটীর সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ ময়দান। ময়দানের প্রান্ত-সীমায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পজুন্ ডাঙের খাড়িটি রেঙ্গুন হইতে বাহির হইয়া উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে জনপদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মাঠটীর দৃশ্য কি সুন্দর তখন। যেদিকে তাকাও যেন সোণা গলানো। গিয়া ডাকিলাম, 'শরৎদা !—ও শরৎদা !'

'কে সরকার নাকি ? আরে এসো এসো ! এতদূরে চিনে আসতে পেরেচ ত ?'

উত্তর করিলাম, 'দেখতে ত পাচ্চেন, পেরেছি। আর নাই যদি পারবো ত এলাম কি করে?'

'তাই ত দেখতে পাচ্ছি। বঙ্গা ত আমার বাসার নাম শুনেই আঁৎকে উঠল সেদিন। আমি ও হতভাগাটাকে কিছু বললাম না। তুমি এসেচ এতে ভারী খুসী হয়েছি, সরকার। এসো, বোসো এসে ভেতরে।'

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেই একটী ক্ষুদ্র কক্ষের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। সম্মুখে কক্ষটীর উপযোগী একটী স্বল্প পরিসর বারান্দা। রেলিঙের একপাশে তক্তার উপর টবে বসানো একটী তুলসীর চারা, অপর পাশে একটী কৃষ্ণচূড়ার গাছ। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম 'এ সব কি শরৎদা।'

'ওহে এটা যে হিঁদুর বাড়ী, একথাটা ভুলে যেয়ো না সরকার!'—বলিয়াই আমার হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিতে টানিতে মাঝের ঘরটীতে আনিয়া বসাইলেন।

প্রথমটায় চোখে পড়ে নাই। এবার ঘরের ভিতরটায় ঢুকিতেই চোখে পড়িল, একটা ইজেলের উপর ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাসের পট। তার গায়ে কেবল পেন্সিলের দাগ—কোথাও কোথাও রঙের পোঁচ। ব্যাপারটা বুঝিতে বাকী রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ শিক্ষার গুরু কে, শরৎদা?'

'এ গুরু আমি নিজে'—বলিয়া বাম হাতের তর্জনী দিয়া নিজের কপালটী দেখাইয়া একটুখানি হাসিলেন। তারপর ছবির পারিপার্শ্বিক দৃশ্যটী কিরূপ করিলে সুন্দর মানাইবে, কোন রঙে ইহার এফেক্ট কিরূপ বাড়িবে সেই সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। মোটের আমি উপর তার একবর্ণও বুঝিলাম না। কেবল চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া গেলাম।

ছবি আঁকার ঝোঁকটার ভিতরে শরৎবাবুর কতখানি যে প্রাণের দরদ ছিল তাহা এতদিন পরে সত্য সত্যই নির্ণয় করা কঠিন। তবে একথা সত্য যে তাঁহার যতটুকু চিত্রকলা বুঝিবার এবং বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল তাহাতে তাঁহাকে চিত্ররসজ্ঞ বলিলে, ভুল হইবার কোনই কারণ ছিল না। এই চিত্রবিদ্যার

প্রসঙ্গে আমাকে সময় সময় অদ্ভুত রকমের সব প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন। 'আচ্ছা বল ত সরকার, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সব চেয়ে বড় পেণ্টার কে?'

উত্তর দিলাম, 'র‍্যাফেল বড় পেণ্টার।'

'উঁহুঁ—হল না। র‍্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলো বড়। তবে বড় বড় আর্ট ক্রিটিকদের মতে, তিসিয়ান সবচেয়ে বড় পেণ্টার।'

ওই সময়ে আমি 'উইণ্ডসর ম্যাগাজিনে' বোধ হয় স্যার জন এভারেস্ট মিলের কি বিখ্যাত নিসর্গ-শিল্পী টার্ণারের চিত্র-পরিচয় পড়িতেছিলাম। ইঁহাদের নাম করিতেই শরৎবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'একালের চিত্রকরদের মধ্যে মিলের টার্ণারের খুব নাম। দুজনেই বিলাতী চিত্রকর। স্যার জোশুয়া রেনল্‌ডস্ ও গেইন্‌স্‌বরোর পর এঁরাই বিলাতের বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী।'

ঐ প্রসঙ্গে এ্যালমা ট্যাডেমার নামও করিলেন। আমি নিসর্গ চিত্রের চিরদিনই পক্ষপাতী। যেমনি বলিয়াছি যে, 'আমার কাছে টার্ণারের ল্যাণ্ডস্কেপ পেণ্টিং খুব ভাল লাগে'—অমনি শরৎবাবু প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু ল্যাণ্ডস্কেপ পেণ্টিং-এর চেয়ে হিউম্যান পেণ্টিং ফোটানো ঢের শক্ত। রীতিমত অ্যানাটমির জ্ঞান না থাক্‌লে হিউম্যান পেণ্টিং ভাল আঁকা যায় না। ছবিখানি হওয়া চাই হুবহু জীবন্ত, তবে ত ছবি। নইলে ন্যাকড়ার ওপর যা-তা রং দিয়ে আঁচড় পাড়লেই ছবি হল না। তোমরা ত র‍্যাফেলের ম্যাডোনা দেখেছ? বাজারে ও-ব্যক্তির খুব নাম হলেও বড় বড় সমালোচকদের কাছে ও থার্ড ক্লাস পেণ্টার বলে গণ্য হয়ে আসচে। তিসিয়ানের কাছে ও দাঁড়াতেই পারে না।'

এই তিসিয়ান সম্বন্ধে শরৎবাবুর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। যতদূর মনে পড়ে শরৎবাবু ইটালিয়ান চিত্রকলার পরেই ফ্লেমিশ্‌ ডাচ এবং বৃটিশ চিত্রকলার প্রশংসা করিতেন। এক রবিবারে গিয়া দেখি, ইজেলের উপর কাপড় ঢাকা একখানা ছবি।

'ওখানা কি শরৎদা ?'

প্রশ্ন শুনিয়াই সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা তুমিই বল আগে কি ওখানা ?'

'কি আর হবে—ছবি।'

'বড় ত বললে ছবি !···ছবি ছাড়া ওখানা আর কি হতে পারে ? কার ছবি যদি বলতে পার ত বুঝি তোমার অনুমানের জোর।'

'যদি বলি নারদ মুনির—?'

'হ্যাঁ তাই। এই দ্যাখ'—বলিয়াই ছবির উপর হইতে কাপড়ের ঢাকনাটা সরাইয়া দিলেন। আমি ত দেখিয়া অবাক। সত্যসত্যই যে সেই বুড়োর ছবি। গ্রাম্য পুকুরের পাড়ে এলোমেলো গাছপালা, তারই মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা ভাঙ্গাচোরা রাস্তা, তারই পাশে একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া একটা বৃদ্ধ। যে একবার ওই নারদমুনিকে দেখিয়াছে সে কদাপি এমন কথা বলিবে না যে, এ আর কারও ছবি। বার্দ্ধক্য ও দারিদ্র্যের উপর নৈরাশ্যের কেমন গাঢ় ছায়াপাত হইয়াছে, সেটাই দেখিবার বিষয়। শরৎবাবু বলিলেন, 'আজ আবার বুড়ো আসবে, তখন বোলো কোথায় কোথায় ডিফেক্ট আছে।'

'যাহোক, আর দুনিয়ার লোক পেলেন না শরৎদা !'

'তা আর কি করব ভাই ! আর লোক কোথায় যে তাকে জিজ্ঞেস করবো। না হয় বটু বাবাকেই জিজ্ঞেস করা যাবে। কি বল বটুবাবা ?' বলিয়া—দাঁড়ে ঝুলানো ময়নাটীর কাছে গিয়া, তাহার মুখে চুমা খাইলেন। বটুবাবাও তাঁর মুখের সঙ্গে ঠোঁট ঘসিয়া তাঁহাকে আদর জানাইল।

'আচ্ছা শরৎদা, এই বুড়োর নাম নারদমুনি হল কেমন করে বলুন ত ?'

প্রশ্ন শুনিয়াই সহাস্যে কহিলেন, 'কেন এই যেমন করে আমার নাম শরৎ চাটুয্যে, তোমার নাম যোগীন সরকার হয়েছে, ঠিক এমনি করেই। তাই যদি বা না হল, ত, অমন পাকা চুল, দাড়ী, গলায় অমন কাঠের মালা, মুখে

হরিনাম, এতেও কি এ বেচারাকে নারদমুনি বলা ভুল হয়।'

'আচ্ছা বুঝলাম। এখন একবার এলে পরে···' মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। সিঁড়ির উপর আওয়াজ শোনা গেল, 'দেবতা ঘরে আছেন?' গলা বাড়াইতে দেখি, সত্য সত্যই নারদ ঋষির আবির্ভাব হইয়াছে। একটুখানি নীচে নামিয়া গিয়া বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া তুলিয়া আনিলাম। সে তখনো হাঁফাইতেছিল। সেই অবস্থায়ই গড় হইয়া তাহার দেবতাকে প্রণাম করিল। ঐ সঙ্গে একটা প্রণাম আমার কাছেও পৌছিল।

শরৎবাবু বৃদ্ধের অলক্ষিতে ছবিখানি তুলিয়া আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন। বৃদ্ধের কোটরস্থ চোখ দুইটী একবার জলজ্বল করিয়া উঠিল। তারপর হাসিভরা মুখে কহিল, 'দেবতা এতও আপনার মাথায় আসে?'

শরৎবাবু প্রত্যুত্তরে কহিলেন, 'দ্যাখ নারদ, তোমাকে একটা কাজ কর্ত্তে হবে। কাজটা ভাবছ খুব শক্ত? না তা নয়। রোজ সকালবেলা আমার এখানে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আসতে পার? চা-টাও খেতে পারবে, আর আমার এই ছবি আঁকাও দেখতে পারবে।'

চায়ের উল্লেখে বৃদ্ধ মনে মনে একবার পরম উপাদেয় বস্তুটীর স্বাদ উপভোগ করিল, পরে মুখেও চপচপ করিয়া বার দুয়েক শব্দ করিল। শরৎবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া উঠিয়া গেলেন। পরে এক পেয়ালা চা লইয়া আসিয়া বৃদ্ধের সামনে নামাইয়া রাখিয়া মধুর কণ্ঠে কহিলেন, 'বড়ই কষ্ট হয়েছে, নাও চা খাও।'

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনাদের হযেছে ত দেবতা?'

'ওহে দেবতাদের কি আর ওটী বাকি থাকতে আছে। তুমি এখন খেয়ে নাও চট করে। নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

তাহার চা-পান শেষ হইলে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহার অবয়বের সহিত ছবির অবয়ব মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন, 'কত যে ডিফেক্ট আছে সরকার তা আর কি বোলবো। যাক্ যখন একবারটী হাত দিয়েছি, তখন আর সোজায় ছাড়াছাড়ি নেই। যাহোক্ একে মনের মত করে

ফিনিস্ কর্ত্তে হবে। নইলে পয়সা খরচের কথা ছেড়েই দাও, বিলকুল মেহনৎটা মাটী হয়ে যাবে।'

আমিও বলিলাম, 'তাই করুন। শরীর-ক্ষয়, অর্থ-ব্যয় এই দু'টোই যেন মাঠে মারা না যায়।'

'ওহে তা আর বলতে হবে না তোমাদের কাউকে'—বলিয়াই তিনি ছবির দিকে মনঃসংযোগ করিলেন।

শরৎবাবু এবারে একখানা নূতন ছবি আঁকার আয়োজন করিতে ছিলেন। নূতন করিয়া সরঞ্জামের যোগাড় করিয়া নূতন ক্যানভাসের উপর এক নূতন চিত্রের পরিকল্পনা নেহাৎ মন্দ হইতেছিল না। তাঁহার সর্ব প্রথম চিত্র 'রাবণ-মন্দোদরী'-খানা কেমন অস্পষ্ট হইয়াছিল। এখানা দেখা গেল সেই সব অস্পষ্টতা দোষ রহিত, অথচ অতিরিক্ত আলোক সম্পাতেও খুব যে উজ্জ্বল তাও নয়। আলো ও ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। যে তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মত নয়। বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এ্যানাটমির জ্ঞান, পারস্পেক্টিভ এবং ব্যাক গ্রাউণ্ডের আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণজ্ঞানও যে নিতান্ত কম ছিল, তাহাও বলিতে চাহি না। মোটের উপর, একসঙ্গে নিসর্গ চিত্র ও মনুষ্যচিত্র মিলাইয়া যাহা হয়, ঠিক তাই, এই তপস্বিনী মহাশ্বেতার চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, প্রকৃতির খেয়ালী-সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।

বর্ষার দিনে অচ্ছোদের তীর ঝাপসা দেখাইতেছিল, ওপারে মেঘভারাবনত আকাশ আরও অস্পষ্ট, ইহার একপাশ দিয়া লাজুক সূর্য একটুখানি উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। তীরে তরুতলে এলোকেশা সদ্যস্নাতা তপস্বিনী মহাশ্বেতা রোরুদ্যমানা প্রকৃতিদেবীরই যেন একখানা জীবন্ত আলেখ্য।

স্বল্পান্ধকার ক্ষুদ্র ঘরটীর এককোণে ছবিখানি এমনিভাবে বসানো যে, দরজার একপাশ খুলিলে যতখানি আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারই সাহায্যে ছবিখানাকে ভালরূপ বোঝা যায়। শরৎবাবু সেই অবস্থায়ই আমাকে

বুঝাইয়া দিলেন। বুঝিলাম, সকল উন্নত কলার মধ্যেই সেই চিরসুন্দরের আনন্দঘন রস-মূর্ত্তিরই বিকাশ সাধনের চেষ্টা। বাস্তবিকই একটুখানি উদার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, আপাত কুৎসিত জিনিষটাও সুন্দর বলিয়া মনে হয়। অবশ্য শরৎবাবু যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছিলেন সেটি নগ্ন সৌন্দর্যেব চিত্র নয়। নগ্ন হইলেও বোধ হয় কুৎসিৎ বলিতে পারিতাম না এই কারণে, যে তাহাব সহিত পাবিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের কেমন চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল।

শরৎবাবুর চিত্রকলার পরিচয় আমিই জানিতাম। ঠাট্টা বিদ্রূপ হইতে নিজেকে এবং শরৎবাবুকে বাঁচাইতে গিযাই কাহারও কাছে একথাটি ভাঙ্গি নাই। তবে এ কথা সত্য যে, এই ছবি আঁকা দেখিবার ঝোঁকেই আমি তাঁহার বাড়ী অত ঘনঘন যাইতাম। কেননা আমার মনে হইত ছবি আঁকা বাস্তবিকই একটা দেখবার মত জিনিষ—কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত চর্চ্চার চেযেও কাজটি ঢের শক্ত। এই উপলক্ষ্যে বসাক মহাশয়ও মাঝে মাঝে শুভাগমন কবিতেন।

॥ তিন ॥

সেদিন হাসির বেগটা একটুখানি প্রশমিত হইলে, দাদামহাশয় হঠাৎ শরৎবাবুর পিঠ চাপড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হঁ্যা ভাই শরৎদা সত্যি করে বলবি ত? লুকোবি-ছাপাবি না ত?'

প্রশ্নের ধরণ ও ভঙ্গী দেখিয়া আমরা ত অবাক। খুড়ো বলিয়া উঠিল, 'দাদামশায় গোপনীয় যদি কিছু বলবার বা জানবার থাকে ত বলুন আমরা আগে থাকতে সরে পড়ি।'

দাদামশায়ের ভাবে বোঝা গেল যে, আমাদেরই সাক্ষাতে এমনভাবে শরৎবাবুর কাছ হইতে জানিয়া লয়েন যে আমরা সহজে ধরিতে না পারি। কিন্তু খুড়োর কথার খোঁচা খাইয়া তাঁহার আর সেরূপ প্রবৃত্তি হইল না। সহজ স্পষ্ট ভাষায় শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শুনতে পেলাম, আমাদের মিত্তির সাহেবের সঙ্গে নাকি তোমার খুব ভাব। কথাটা সত্যি কিনা?'

শরৎবাবু কথাটার উত্তর দিলেন। কহিলেন, 'সত্যি বই কি দাদামশায় খুবই সত্যি। তাই ত অনিচ্ছাসত্বেও একমাত্র তাঁরই অনুরোধে পড়ে আপনাদের অফিসে চাকরী নিচ্ছি।'

'বেশ, বেশ, ভ্যালা মোর দাদা। এইবার হাতখানা দাও দিকিন'—বলিয়া তাঁহার ডান হাতখানা মুখে ঠেকাইয়া কহিলেন 'আঃ! কি কপালটাই করেছ দাদা! মিত্তির সাহেব হেন মানুষ, সে তোমার বন্ধু। যা হোক দাদামশায়ের কথাটা ভুলে যেয়ো না।'

কথাটা একটুখানি স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। মিত্তির সাহেব ওরফে মিষ্টার এম, কে, মিত্র আমাদের ডেপুটি একজামিনার। খুব কৃতি অফিসার। অফিসের

ফিরিঙ্গী সাহেবগুলা তাঁহার নামে কাঁপিতে থাকিত। সেই মিত্তির সাহেবের সহিত দাদামশায়ের একটু পরিচয়ের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। অফিসের কার্য ব্যপদেশে দাদামশায় পূর্ব্বে লুধিয়ানা, আম্বালা, জলন্ধর, শিয়ালকোট প্রভৃতি অঞ্চলে চাকুরী লইবার পর স্বেচ্ছায় বর্ম্মায় বদলি হইয়া আসেন। নানারূপ দুর্ঘটনার জন্য অফিসের কাজে গুরুতর রকম ভুল হইতে থাকে। অনেকগুলি টাকা নাকি তদ্দরুণ সরকার বাহাদুরের লোকসান পড়ে। তাহারই জন্য দাদামশায় একাউনটেণ্ট হইতে কেরানীগিরিতে ডিগ্রেডেড হইয়া যান। দুঃখেরি কথাটা বটে। কিন্তু মিত্তির সাহেবের পূর্ব্বতন কর্ম্মচারীরা অফিসের কাগজপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে এমন সব মন্তব্য লিখিয়া যান, যাহা কাটাইয়া উঠা দাদামশায়ের পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়িল। সুরসিক অমায়িক দাদামশায় ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

এই দাদামশায়কে লইয়া শরৎচন্দ্র খুব আমোদ করিতে ভালবাসিতেন। ঠাকুর দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত, প্রেত প্রভৃতি অপদেবতাদের অস্তিত্বেও তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং সেই সমস্ত বিষয়ে গল্প করিতে তাঁহার এত ভাল লাগিত যে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। একদিন নাকি তাঁহার বাটীতে কই মাছের পেটের ভিতর হইতে সর্প বা ঐ জাতীয় একটী ক্ষুদ্রাকার জীব বাহির হইয়াছিল। শরৎবাবু অনেক সময় একথা সেকথার পর এমন কায়দায় গম্ভীরভাবে এই কথাটী দাদামশায়কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কাহারও সাধ্য থাকিত না, যে তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব 'রগড়-নাট্যের' একটু অভিনয় করিয়া যাইতেছেন। দাদামশায় যখন পূর্ণ উৎসাহে মৎস্যের উদরস্থ জীবটিকে একটী অজগর সর্প আখ্যা দিয়া তাঁহার আখ্যায়িকাটিকে জমাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন, তখন শরৎচন্দ্র বলিয়া উঠিতেন, 'আচ্ছা দাদামশায়! এ গল্প ত শোনা হল, এইবার আপনার আটকের গল্পটা বলুন ত?'—বলিতেই দাদামশায় জবাব করিয়া বসিতেন 'ঐ ত তোমাদের দোষ দাদা? একটা গল্প সারা না হতেই আর একটা? সে আর একদিন হবেখন।'

শরৎবাবু বহুকষ্টে হাসি চাপিয়া উত্তর করিতেন, 'ঠিক বলেছেন দাদামশায় ? অরসিকস্য শিরসি মা লিখ, মা লিখ।' বলিয়াই, তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে হাসিটাকে মিশাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন। আর আমরা ? দাদামশায়ের গল্প ও শরৎবাবুর গাম্ভীর্যে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতাম না। শরৎবাবু ঐরূপ গম্ভীরভাবেই হয়ত দাদামশাইকে নমস্কার করিয়া শিস দিতে দিতে হাতের লাঠি গাছটা সঞ্চালন করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইতেন। প্রকৃতির অদ্ভুত উপাদানে গড়া এই মানুষটির দিকে আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতাম।

একদিন গানের পর চা খাইবার পালা। দাদামশায়ের ফরমায়েশী বিরাট আকৃতির কাপের পর ৩।৪ কাপ চা তৈয়ারী করিতে গেলে রীতিমত ডেক্‌চিতে করিয়া জল গরম করিতে হইত। শরৎবাবু রীতিমত চা-খোর হইলেও দাদামশায়ের অতিথি সৎকারের বহর দেখিয়া জোড় হাতে কহিলেন, 'দাদামশাই ! এরকম পেয়ালায় চা খেতে হলে সেই দ্বাপর যুগের বৃকোদরের প্রয়োজন। একেই অম্বলের রুগী, তার ওপর আবার বোগ্‌নো প্রমাণ চা। হয়েছে দফারফা এইবারে !'

'নে ভাই আর ন্যাকামো করিস নে'—বলিয়া দাদামশাই পরম সমাদরে এক পেয়ালা চা শরৎবাবুর সুমুখে অগ্রসর করিয়া দিলেন।—'নে দাদা মুখটিতে ঠেকালেই কোথায় চোঁ করে উড়ে যাবেখন। এ ত কাপই নয়, যখন জলন্ধরে ছিলুম, তখন বললে বিশ্বাস যাবি নে ভাই, এ্যাতো বড় ছিল আমার কাপটা। সেখানে ভাই কফি বেশী খেতুম। আঃ, কি ঠাণ্ডা জায়গা। পোড়া রেঙ্গুন আর ভাল লাগে না। কি বল মিত্তিরজা ?'

মিত্রজা উত্তর করিলেন, 'সে কথা আর বলতে। একশ'বার এ যায়গা আমার অপছন্দ। তবে কি না কপাল। নইলে সিমলা হেন জায়গায় যাবার

সব ঠিক ঠাক্। তা পোড়া কপাল আমাকে কি না টেনে আনলে এই মগের মুলুকে! কি কপালটাই করেছিলুম আর জন্মে, তাই জাত খোয়াতে এলুম রেঙ্গুন সহরে। তুমিও যেমন দাদা! একটীবার পেন্সনের টাকাটা হাত করি, তারপর এ জায়গায় থাকে কোন ব্যাটা!'

আমরা কেহই মিত্রজার এই কথায় হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। শরৎবাবুও উচ্ছ্বসিত হাস্য-লহরীর মধ্য হইতে বলিয়া উঠিলেন, 'দাদামশাই! আপনার আটকের গল্পটা ত একদিনও শোনা হয় নি। সেই ইণ্ডাজের ধারে কি হয়েছিল না?'

দাদামশাই কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিলেন, 'ওঃ! সেই পাঠানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ত?'

শরৎবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

'কি শরৎদা, বল না ভাই কোনটা?'

'হ্যাঁ ঐটেই বলতে বলছি দাদামশায়!'

দাদামশায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'ওরে ভাই সে কি বলবো রে দাদা! বললে প্রেত্যয় হবে না। এমনি সময়টায় চলেছি ইণ্ডাজের ধার দিয়ে রাস্তা ধরে বরাবর দক্ষিণ মুখো। সূর্যদেব লাল টক্ টক্ করছেন জবা ফুলটির মতন। মনে করলুম একবার, সামনের এই বস্তীগুলো একটীবার ঘুরে আসা যাক্। চলতে চলতে একটুকুন পরেই সন্ধ্যা হয়ে এল। কৃষ্ণপক্ষ কিনা, দেখতে দেখতেই অন্ধকার জমাট হয়ে এল। বলব কিরে দাদা, আমার পেছনে মানুষের সাড়া পেতেই যেমনি ঘাড় ফিরিয়েছি কি, অমনি দেখি ইয়া মাথায় পাগড়ী ইয়া যমের মতন চেহারা, ইয়া প্রকাণ্ড বড় লাঠি হাতে দুই পাঠান—আমাকে ধরবার জন্যে ছুটছে। বেশী বড় নয়, দেড় হাত লম্বা একখানা রুল নিয়ে আমি সদা সর্বদাই চলাফেরা করতুম। কি জানি দৈবে কখনও দরকার হয়ে পড়ে যদি। আমিও মালকোঁচাটা না মেরে নিয়ে রুল বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ভাবলুম, আগে কোন কথাটী বলব না। একবার ওদের দৌড়টা দেখে নি, তারপর এর

যা বিহিত হয়, তা করা যাবে। ভাবতে ভাবতেই বলব কি রে দাদা, এক শালা পাঠান করলে কি আমার বাঁ হাতটা খপ করে ধরে ফেললে। যেমনি ধরা, কি মেরেছি শালার হাতের কব্জিতে রুলের এক ঘা। ঘা খেয়েই মাটিতে না পড়ে ভুঁই কুমড়োর মতন গড়াতে গড়াতে শালা গিয়ে পড়ল ইণ্ডাজের মধ্যে। আর এক শালা যেমনি আমাকে রুখলে, কি, অমনি খপ করে তার দাড়িটা না ধরে বোঁ বোঁ শব্দে তাকে ঘুরপাক দিতে লাগলুম। যাবি ত যা, শালা করলে কি আমার হাত ছট্‌কে গিয়ে পড়ল ইণ্ডাজে। • এক গোছা দাড়ি আমার হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়ে গেল।'

আমরা বহু কষ্টে হাসি চাপিয়া গেলাম।

দাদামশায় বলিতে লাগিলেন, 'ভাইরে! এই পাঠান জাত কি দুর্ধর্ষ! একবার পেশোয়ারে এক মেম সাহেবকে বাজারের ভেতর কেটে ফেললে। কিন্তু বীরের জাত বলি ভায়া এদের। খুন করেছে, স্পষ্ট কবুল করলে, তার-পর তার ফাঁসী হয়ে গেল।

এতক্ষণ পরে এইবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা দাদামশায় আপনার সে দু'টী পাঠানের কি হল শেষে?'

'শুনলুম, কোন কাগজে নাকি বেরিয়েছে যে, ঘণ্টাখানেকের পরে দু'টো পাঠানকে আধমরা অবস্থায় পুলিশ জল থেকে তুলে চিকিৎসার জন্যে হাস-পাতালে ভর্তি করে দিয়েছে।'

'এইবারে দাদামশায়, আমার কথাটীও ফুরোল, নটে গাছটীও মুড়োল— কেমন কি না?' বলিয়া শরৎবাবু একটুখানি হাসিলেন।

'হ্যাঁরে শরৎদা তোরা কি বলতে চাস্ যে আমি রূপকথা বললুম এতক্ষণ তোদের কাছে? দেখবি তবে সে রুলখানা?'

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'আর রুল বের করতে হবে না দাদামশায়! শরৎদার রহস্য বুঝতে পারছেন না?'

শরৎবাবু হাতজোড় করিয়া দাদামশায়ের সুমুখে আসিয়া অনাবিল হাস্যে

মুখখানাকে উজ্জ্বল করিয়া বলিলেন, 'দাদামশায়! সত্যি সত্যি আমি আপনার কথাগুলোকে রূপকথা বলি নি। তবে অনেকটা আশ্চর্য রকমের মনে হয়। তা দাদামশাই সংসারে আশ্চর্য বলতে কিছু নেই, সবই সম্ভব। আমরা সম্পর্কে নাতি হই, তাই নটে গাছের ছড়াটি বললুম। এতে কিছু মনে করতে আছে দাদামশায়?'

দাদামশায় মনের আবেগ সম্বরণ করতে না পারিয়া শরৎবাবুর চিবুকটী ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, 'সত্যিই কি আমি কিছু মনে করেছি রে শরৎদা! কিছুই মনে করি নি। তবে একটী কথা রাখবি ত? বুঝলি কি বললুম, একেবারে ভুলে থাকিস নি যেন। দাদামশায়কে মাঝে মাঝে মনে করিস।'

'তা কোরবো দাদামশায়। এখন তাহলে আসি—প্রণাম।'

'আঃ বেঁচে থাক দাদারা সব ধনে বংশে সুখে সচ্ছন্দে।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল। আমরাও স্বল্পালোকদীপ্ত রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

শরৎবাবু মিত্তির সাহেবের বাসা হইতে উঠিয়া মেসে আসিয়াই বন্ধুকে পরিহাস করিয়া বলিলেন, 'ওহে বঙ্গচন্দ্র! তোমাদের মেসে ত আনলে, এখন অষ্টগণ্ডার ঠ্যালায় রক্ত আমাশা না ধরাও!'

বন্ধুটীর নাম বঙ্গচন্দ্র দে, পরিহাস রসে শরৎচন্দ্রের সমকক্ষ। অমনি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব করিয়া বসিলেন, 'ওরে তুই আসবি বলে মেস থেকে আমরা লঙ্কার পাট তুলে দিয়ে হিং আর গুড় চালাতে সুরু করেছি।'

'বটে! তা হলে তোদের উন্নতি হয়েছে বল! দেখিস এখন তোদের পেটে সইলে হয়! ওরে দ্যাখ শুঁটকি ফুঁটকি ত খাস নে মেসে?' বলিয়াই শরৎবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

'রামচন্দ্র! এখন থেকে শামুক কেঁচো খেতে সুরু করতে হবে যে!'

'কি বললি—কি বললি রে বঙ্গা? শামুক কেঁচো কিরে?'

'আরে ওই যে তোদের হুগলি অঞ্চলের লোকে যাকে পরম সমাদর করে গুগ্‌লি বলে খায়, আমরা মুখ্যু বাঙ্গাল মানুষ ওকেই শামুক বলি।'

'মুখ্যু যে, সে কথা একশ'বার সত্যি, আর বাঙ্গাল যে, সে কথা দুশ'বার সত্যি। শামুককে কি গুগলি বলে রে মুখ্যু! গুগলি বলে ওর ভেতরে যেটা থাকে সেইটেকে। এখন বুঝলি ত?'—বলিয়াই শরৎবাবু এমন ভাবে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, যে তাহাতে মনে হইতে লাগিল, যেন বাড়ী ঘরের ছাদ ফাটিয়া যাইতেছে।

বঙ্গচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ একটু হাসিয়া জবাব করিয়া বসিলেন, 'অর্থাৎ, যে পরম পদার্থ কিনা শাঁস বস্তুটি ওর মধ্যে থাকে, সেইটা ত? তা হোক গে, শাঁস বস্তুই হোক্—আর ছাল পদার্থই হোক্ জিনিষটা যে ভদ্রলোকের খাদ্য নয়, একথা পাঁচশো বার সত্যি!'

'যা হোক তোর মুখে এত কথা ফুটেছে এইটেই পরম লাভ! কি বলিস বঙ্গা বল ত?' বলিয়াই, শরৎবাবু বঙ্গচন্দ্রের মুখের পানে বোধ হয় একটা উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিলেন।

উত্তরটা যে বঙ্গচন্দ্রের মুখের উপযুক্তই হইল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গচন্দ্র বলিয়া বসিলেন, 'ওরে মুখ-সর্ব্বস্ব। তোরা ত মুখের জোরেই বাঁচিস্। মুখ না থাকলে তোদের যে কি হত, তা আর বলতে চাই নে।'

'আর বাকী কি রাখলি ভাই? বলেই ফ্যাল না।'

'আর বলতে চাই নে। বুঝে নে যদি বুদ্ধি থাকে ঘটে।'

'বটে। ভারী ত চালাক হয়েছিস দেখছি। এইবার তোর ত্বাশে যত লোক আছে সকলকে এক এক করে নিয়ে এসে তোর মতন চালাক বানিয়ে নে।'

'তথাস্তু, মশাইয়ের আদেশ শিরোধার্য।' বলিয়া, বঙ্গচন্দ্র মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সেদিন অপরাহ্ণে শরৎবাবুর বাসায় বেড়াইতে যাইতেছি, সিঁড়ির উপর হইতেই একটা ভীষণ চীৎকার শুনিতে পাইলাম। কণ্ঠস্বরেই বুঝিতে পারিলাম শরৎদা। কিন্তু এ বীর-বিক্রম কার উপরে? চাকর ঠাকুর যাই বলি, সে জীবটী ত নেহাত গোবেচারী। খোলা দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখি, একখানা লোহার চিম্‌টে হাতে বীর বেশে শরৎদা, রুগ্ন শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বন্ধু বঙ্গচন্দ্র। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি হে বঙ্গবাবু? এ যে দেখছি রীতিমত যুদ্ধের সজ্জা।'

বঙ্গবাবু একটুখানি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'আপনার শরৎদার কাণ্ড। কতবার বলেছি যে গাধা পিটিয়ে কি ঘোড়া করা যায়। তা উনি ত শুনবেন না। আমার জন্যে দিয়েছিলেন জল গরম করতে। একবার জল গরম করে নামাতে গিয়ে ঢেলে ফেলেছে, আরেকবার উনুন নিবিয়ে ফেলেছে? বেচারী যে হাত-পা পুড়িয়ে ফেলে একটা কাণ্ড করে বসে নি, সেও ভাল।'

আমি হো হো শব্দে হাসিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, বেচারী যে মূল্যবান পায়ের বদলে সামান্য একটু জল ফেলে দিয়েছে, তাতে দোষ কিছুই হয় নি। বুদ্ধিমান লোকের লক্ষণই হচ্ছে সকলের আগে আত্মরক্ষা, তারপর দুনিয়াদারী।'

আমার মন্তব্যে বঙ্গচন্দ্র হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ—'

তাঁর মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ আমি উক্তি করিলাম, 'ধনৈরপি দারৈরপিচ?'

বঙ্গবাবু আমার কথায় হো হো শব্দে হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এই দুইটীরই যা অভাব।'

সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের ভিতর হইতে শরৎবাবুর গলার ঝঙ্কার পাওয়া গেল, 'ওরে বঙ্গা। তুই বেটা এবার নিজে ত মরবিই, আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে মারবি। অত গলাবাজি করলে বুক ফেটে যে মারা যাবি রে হতভাগা।'

বঙ্গবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন। অমনি উত্তর করিয়া বসিলেন, 'ওরে মরিই ত আগে, তারপর তোর সহ্য না হয় সহমরণেই নয় যাস্।'

'ওরে থাম থাম বঙ্গচন্দ্র। আর রসিকতা ফলাতে হবে না। মরি কি নামের বাহাদুরী। সারা দেশে আর নাম খুঁজে পাবার জো নেই। বুঝেছ ত সরকার। আমরা ত শুনেছি কেবলই ওই জগৎচন্দ্র, পূর্ন্নচন্দ্র, অপন্নাচরণ,-- ইনি আবার বঙ্গচন্দ্র। নামের বালাই নিয়ে মরি। মাদ্রাজীদেরও যেমন কথা বুঝি নে, এদেরও তেমনি, নিজেরা নিজেরা যখন কথা কয়, কি যে কয় ভগবানই জানেন। তাই তাদেরও বামুন হলেই আয়ার হওয়া চাই বেশীর ভাগ, আর নামটী হওয়া চাই সুব্রমণি—এদেরও তেমনি, বামুন হলেই খেতাব চক্কত্তী, আর নাম জগৎচন্দ্র। বাবা এত জগৎচন্দ্র রেঙ্গুন সহরে থাকতেও সহর আলো হচ্ছে না। দেখা যাক এইবারে যদি বঙ্গচন্দ্র একটা কিছু করে বসেন। যে রকম জোর কলমে পলিটিকাল ইকনমি সম্বন্ধে লেখা মক্‌সো হচ্ছে, আমার ত বড্ডই ভাবনা হয়েছে ভাই, মিল-টিল বুঝি এবারে চাপা পড়ে যান। আমরা নিরক্ষর মানুষ, দু' হরফ বাংলাই শুদ্ধ করে লিখতে পারি নে, তা আবার ইংরেজী।'

'লিখতে না জানিস্ আমার লেখা পড়ে শেখ, বুঝলি রে শরতা।' বলিতেই শরৎচন্দ্র উত্তর করিলেন 'এই সামনের শ্রীপঞ্চমীর দিনে দুর্গা বাড়ী গিয়ে হাতে খড়ি দিয়ে আসি, তারপর তোর কাছে পাঠ নেবো বুঝলি ত?'

উভয় বন্ধুতে এইরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ কথাবার্তাই হইত।

একজামিনারের অফিস্ ছিল অনেকটা নিজেদের বাড়ি ঘরের মতন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনেক সময়ে গল্পগুজবে কাটিয়া গিয়াছে। আমাদের উপরিতন

কর্মচারীদের অনেকেই ছিলেন সাদা সাহেব। তাঁহাদের ব্যবহারও ছিল চেহারার মতনই সাদা। সময় মত কাজকর্ম সমাধা করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহারা খুসী থাকিতেন, নচেৎ আমরা কি করি, তাহা তাঁহারা আদৌ লক্ষ্য করিতেন না।

হঠাৎ একদিন শরৎবাবু অফিসে আসিয়া ঘোষণা করিলেন, 'ওহে। আজ ভারি একটা মজা হয়েছে। বসাক এলে একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখো চিনতে পারো কি না।'

ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া থাকিতেই শরৎবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'ওহে এ লোকটাকে দেখে তোমরা কেউ চিনতে পারো?'

সত্য সত্যই আগন্তুকটাকে দেখিয়া সহসা চিনিবার উপায় ছিল না, কেন না যে বেশে তিনি আগমন করিলেন, সে বেশের সঙ্গে তিনিও যেমন অপরিচিত, আমরাও তদ্রূপ। পরণে আটহাতি ধুতির পরিবর্তে খাকীর হাফ প্যাণ্ট, তার নীচে পটি জড়ানো, পায়েও বর্ম্মাফানার স্থানে এডওয়ার্ড শ্লিপার, গায়েও সনাতন কোটটার বদলে একটি কুমিল্লা-ছিটের বুক-খোলা কোট। সবচেয়ে বাহার—মাথায়, সেখানে একটা পাগড়ী-টুপি, ঠিক হুবহু যাত্রাদলের মন্ত্রীর শিরস্ত্রাণের মত।

বসাক মশায় অফিসে ঢুকিতেই আমরা সকলে একযোগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাততালি দিয়া সকলরবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। দাদামশায় এক গাল হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আহা ঠিক মানিয়েচে—যেন লোহার কার্ত্তিকটা।' বলিয়াই পুনরায় সংশোধন করিয়া কহিলেন, 'না দাদা। ভুল হয়েছে ঠিক যেন বাঁকা শ্যামচাঁদটা—যে পাগ্ মাথায় দিয়েছ হে বসাক, ওর ওপরে একটুখানি ময়ূরের পাখা গুঁজতে পারলেই ঠিক মোহনচূড়াটা হত। আর যদি বল সখিদের কথা, তাই বা কম কিসে। যা শুনতে পাই তাতে ত এ পক্ষেও কম নয়। যাক্ গে যাক্ গে। আচ্ছা এ মোহন বেশটা কিসের জন্যে বলত একবার?'

বসাক মশায় কোন কথা বলিবার পূর্বেই শরৎবাবু তাঁহার হইয়া উত্তর

করিলেন, 'ওহো। বুঝতে পাচ্ছেন না দাদামশায়। বসাক আজকে যে জুরর হয়েছে চীফ কোর্টে।'

'বটে, খুনী মকদ্দমা নিশ্চয়ই। ছাখ ভাই বসাক, বর্ম্মী হলে আর ছাড়িস নি? একদম সরাসরি গিল্‌টী বলে বসবি।'

বসাক মশায় তখন গম্ভীর চালে উত্তর দিয়া বসিলেন, 'বুঝেছ চৌধুরী সেটা হল আইন আদালত, ন্যায় বিচারে যা সাব্যস্ত হবে, সেই রায়ই দেওয়া হবে। সমস্ত হাল না জেনে শুনে আগে থেকেই কি বলা যায়—গিল্‌টি কি নট-গিল্‌টি।

শরৎবাবু একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, 'বুঝলে ত বসাক! তোমার লটারিরও যেমন দু এক নম্বরের তফাতে অনেক ওলট পালট হয়ে যায়, এ ফৌজদারী মামলাও অনেকটা তেমনি। প্রমাণ হলেই নির্ঘাত ফাঁস, আর না হলেই বেকসুর খালাস। একটু সন্দেহ থাকলেই আসামী বেচারী অনেক সময় ফাঁসী কাঠে ঝোলা থেকে বেঁচে যায়। দেখো যেন ভাল মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলিও না।'

বেলা দুটোর সময় বসাক মশায় ফিরিয়া আসিয়া আসিয়া এক গাল হাসিয়া কহিলেন, 'আজ কেস্ ওঠেই নি। যাহোক ফাঁকতালে ফিয়ের টাকাটা আজকের মত মেরে দেওয়া গেল। এই রকম করে দু একটা দিন, হয় ত মন্দ কি চাটুয্যে মশাই?'

চাটুয্যে মশাই হাসিয়া বলিলেন, 'সত্যিই বলচ ত মামলা ওঠে নি—না তুমিই কোর্টের চেহারা দেখে ভড়কে গিয়ে ভেতরে ঢুকতে সাহস পাও নি? হলফ করে বল ত কোনটা সত্যি? ভুলে যেয়ো না কিন্তু ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে কথা বলা মহাপাপ। তা ছাড়া গর-হাজিরীর দরুণ ফাইন্ হবে।'

'আরে রামচন্দ্র? কি যে বল চাটুয্যে, তা বুঝতে পারি নে। মিথ্যা কথা বলতে যাব কেন বল তো? বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা করেই ছাখ আমাকে কি কি দেখে এলুম সেখানে।'

'যাক্ গে মরুক গে—ওসব বলে আর আমাকে বোঝাতে যেও না বসাক। আদালতে হামেশা কি কি ব্যাপার ঘটে থাকে, তা একরূপ সবারই জানা আছে। বানিয়েও অমন দু'চারটে কোন গল্প না বলা যায়। সে যাই হোক, আর যাই কর, দায়িত্বটা যে কত বড়, তা ত জানো ?'

'না ভাই আজ মামলা আর হল না। কোর্ট বসতেই জজসাহেব তারিখ ফেলে দিলে সাতদিন পরে। আরেকটা পেণ্ডিং কেস্ ছিল আদ্যিকালের, সেইটেরই তলপ হল।'

'ব্যস ব্যস ! এর পরে যেদিন যাবে পোষাক-আষাকটা একটুখানি ভদ্র-গোছর করে যেয়ো।'

সপ্তাহ পরে আবার নির্দ্দিষ্ট দিনে বসাক মহাশয় ধড়াচূড়া পরিয়া আসিলেন। এবার বেশভূষা বেশ উন্নত ধরণের দেখা গেল। একটা লম্বা পা-চেপা প্যাণ্ট, তার উপর একটা কালো রকমের কোট, মাথায় একটী বাবু ক্যাপ্। পায়ে তালি দেওয়া হইলেও একজোড়া সু, এবং পুরাণো একজোড়া কালো রঙের মোজা শোভা পাইতেছে। দাদামশায় নিজের ক্ষৌরমসৃণ মুখখানায় বার দুই হাত বুলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বসাক, বেশ পোযাক করেছ বটে, কিন্তু মুখখানায় কেমন খোঁচা খোঁচা গোঁফ বেরিয়েই বিশ্রী হয়েছে দেখতে। একটুখানি সাফ্ সুতরো হয়ে আসতে হয় ত। পোষাক-আষাক ভাল করে করতে হলে আগে থাকতে কামিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবার দরকার।'

শরৎবাবু একটুখানি হাসিয়া টিপ্পনী কাটিলেন, 'বুঝতে পাচ্চেন না, অত পরিচ্ছন্নতা বসাকের ধাতে পোষাবে না তাই একটুখানি ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেছে।'

'যা বলেছিস শরৎদা। সেদিন বসাক যে ঠ্যাং-কাটা খাকীর প্যাণ্ট পরে পায়ে পট্টি জড়িয়ে, এডওয়ার্ড স্লিপার পরে এসেছিল, তার চেয়ে আজ ঢের ভাল হয়েছে।'

অফিসের সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি—শরৎবাবু, বসাক মশায় ও আমি, এমন সময় পিছন হইতে চেনা গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'হ্যালো বৈসাক-বাবু।'

পশ্চাতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, আমাদের অফিসের সেই বিদ্‌ঘুটে সাহেব ল্যাজারো—দুই তিন থান বড় বড় রেজিষ্টার ডান বগলে চাপিয়া, বাঁ হাতে ছাতা লইয়া একটা বড় রকমের বর্ম্মা চুরুট টানিতে টানিতে আসিতেছে। আমরা একটুখানি দাঁড়াইতেই কাছে আসিয়া সহাস্যে বলিল, 'হ্যালো ব্রাদার। আই সি ইউ আর অল্ ফ্রি ফ্রম ট্রাবল্স্। ড্যাম, নন্সেন্স কচ্ড়া ওয়ার্ক। ওঃ হেল। দেযার ইজ নো হেণ্ড (এণ্ড) অব্ ইট।'—ইত্যাদি অপূর্ব্ব ইংরাজী ভাষায় অফিসের কাজকর্ম্ম থেকে সুরু করিয়া মায় পিয়াদা-পিয়ন এমন কি বড় সাহেব পর্যন্ত কাহাকেও বাদ দিল না, যাহা মুখে আসিল, গড়গড় করিয়া বলিয়া ফেলিল।

এই ল্যাজারো সাহেব আমাদের এক্‌জামিনারের অফিসের এক অপূর্ব্ব চিজ। বাড়ী মান্দ্রাজ অঞ্চলে। পূর্ব্বতন পুরুষ নাকি ছিল গোয়ানিজ। এই অপূর্ব্ব কৌলিন্যের দাবিতে ল্যাজারো ইউরেশিযান বলিয়া পরিচিত।

ইহাকে আমরা সকলেই খুব পরিহাস করিতাম। বিশেষতঃ ইহার ইংরাজী জ্ঞান লইয়া। অপূর্ব ভাষা-জ্ঞানের সঙ্গে অদ্ভুত উচ্চারণও উল্লেখযোগ্য। মোটের উপর পুঁথি-পত্রের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। হস্তাক্ষরও আহামরি। সজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া অক্ষরগুলি যে সাহেবেরই লেখনী-সম্ভূত তার দূর হইতেও টের পাওয়া যাইত। একবার একখানা ক্যাজুয়াল লিভ-এর তিন লাইনের দরখাস্তে সাহেব যে অদ্ভুত ইংরাজী জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিল তাহা যে, ফ্যাসিমিল করিয়া রাখার উপযুক্ত। তিনটি লাইনে তিনগণ্ডা ভুল বাহির করিয়া শরৎবাবু বাস্তবিকই সাহেবকে সেদিন চমক লাগাইয়া দিয়াছিলেন। সাহেব ত প্রথমটায় প্রচণ্ড বক্তৃতা দিতে গিয়া বার দুই-তিন 'হোয়াট'-'হোয়াট' করিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। পরে অর্ধদগ্ধ চুরুটটা

জোরে জোরে বার কয়েক টানিয়া বিরক্ত হইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া প্যাণ্টের দুই পকেটের মধ্যে হাত দুখানি ঢুকাইয়া দিয়া গম্‌গম্‌ শব্দে পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। সাহেবের অবস্থা দেখিয়া আমরা ত অবাক্। অবশেষে তাহার ধৈর্য যখন চরম-সীমায় পৌছিল, তখন সগর্ব্বে বুক ঠুকিয়া বলিল, 'হল রাইট! (অল্ রাইট) ইউ ফেলোস্ টক বাবু ইংলিশ, স্টিল ইউ বোষ্ট। হোয়াট এ নন্‌সেন্স ইজ দিস ম্যান। কাম এ্যালং ম্যান আই উইল শো...'

'শো হোয়াট, ব্রাদার?'—বলিতেই শরৎবাবুর প্রশ্নে সাহেব একটুখানি বিব্রত হইয়া পড়িল। বোধহয় ভাবিল, পেটে যা বিদ্যা এ লইয়া আর চ্যাটার্জির সঙ্গে বোঝা পড়ায় কাজ নাই। যদিই হাটের মাঝখানে হাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলে ত সব সাহেবীয়ানা জাহির হইয়া পড়িবে। সুতরাং, অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, যে বাংলা দেশের বাবুরা ভয়ঙ্কর গ্রন্থকীট। তাই তাহাদের সহিত কেতাবী বিদ্যায় পারা যায় না।

কি কারণে ঠিক মনে নাই,—সাহেব পুরা এক শিট কাগজ লইয়া তাহার উপর মেলাই পেন্সিলের অঙ্কপাত করিয়া চলিয়াছে। শরৎবাবু একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাদার কি এবার একাউণ্টেণ্টশিপ একজামিন দেবে নাকি?'

ব্রাদার বাঁ হাত দিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চুলের গহন বনের মধ্যে বোধ হয় কোন গভীর তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছিল। অমনি মুখ তুলিয়া উত্তর করিল, 'নো চ্যাটার্জি আই অ্যাম্ ওয়ার্কিং আউট এ বিগ সাম।'

'দেখি ত বিগ সামটা একবার'—বলিয়াই শরৎবাবু বহু কষ্টে মূল অঙ্কটা যাহা আবিষ্কার করিলেন, তাহা হইতেছে, এক অষ্টম এবং তিন অষ্টম যোগ করিলে কত হয়। এই অঙ্কের উত্তর বাহির করিতেই সাহেব গলদঘর্ম হইয়া

গিয়াছে। তবুও উত্তরটা ঠিক ঠিক ধরিতে পারিতেছে না। সাহেব তাহার অদ্ভুত জ্ঞানবলে আটে আটে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করিয়া, তিনের বর্গফলের সহিত সমস্তগুলিকে একবার গুণ এবং একবার ভাগ করিয়া বড় বড় অঙ্কের সমাবেশ করিতেছিল। আমরা তাহার এই অপরিসীম পাণ্ডিত্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শরৎবাবু পেন্সিলটী তাহার হাত হইতে টানিয়া লইয়া যখন অতি সহজে উত্তর বাহির করিয়া দিলেন, তখন সাহেব আশ্চর্য হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হোয়াট এ নন্‌সেন্স ঈজ দিস্ চ্যাটার্জ্জি? এ্যান্সার ঈজ ওন্‌লি ওয়ান্-হাফ্? ছ্যাট ক্যাণ্ট বি ব্রাদার। ইট ইজ কোয়াইট এ্যাবসার্ড। টোটাল ক্যাণ্ট বি সাচ এ স্মল্ সাম।' যোগফল এত সামান্য হওয়াতে সাহেব রীতিমত অস্বস্তিতে পড়িল।

'দেন ইউ বেটার ব্রেক ইওর হেড আপন ইট'—বলিয়াই শরৎবাবু সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। তাহার পর সাহেব অফিসে একে একে সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া যখন একই উত্তর পাইল তখন বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।

সাহেব সারাদিন অফিসে কাজ করিয়াও কাজ ফুরাইতে পারিত না। তারপর যতদূর সম্ভব খাতাপত্র, ফাইল বাড়ী বহিয়া লইয়া যাইত। আর রাস্তার লোককে ডাকিয়া রটন অফিস ও নিজের ব্যাড্ লাক্-এর কথা বলিয়া কতকটা মনের আফ্‌শোষ মিটাইবার চেষ্টা করিত। কেহ বা শুনিত কেহ বা একটুখানি হাসিয়া সাহেবকে প্রবোধ দিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু সাহেব ছাড়িলে ত? সে এমনি নাছোড় যে, অমনি সে লোকটার পিছন পিছন তাহার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজের মনে বকিতে বকিতে ছুটিতে থাকিত। পরে বলা শেষ হইলে, আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইত।

একদিন কাছে আসিয়া বাঁ হাতের ছাতাটা বাঁ কাঁধে ফেলিয়া দিয়া সাহেব

বসাক মহাশয়ের গা টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কৈ, বৈসাক মোশায় ভাল আছ ত ?'

'যা পাগলের—' বলিয়াই বসাক মহাশয় বাকী কথাটুকু আর শেষ করিতে পারিলেন না, মাঝখানে থামিয়া গিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'দেখেছ হে সরকার। ব্যাটা আবার বাংলা কয়। এমনিই বিদ্যে ছরকুটে পড়ে, আর বাংলায় কাজ নেই চাঁদ। বাংলা শেখা তোমার মত ট্যাস্ ফিরিঙ্গির কম্ম নয়।'

বসাক মহাশয়ের কথা বলার ভঙ্গীতে শরৎবাবু ও আমি দুজনেই না হাসিয়া পারিলাম না। সাহেবের ত বাংলায় অত বিদ্যার দৌড় নাই, তাই বসাক মহাশয়ের কথা ভাল মত বুঝিতে না পারিয়া, বিশেষতঃ আমাদের দুজনকে হাসিতে দেখিয়া একটুখানি ভড়কাইয়া গেল। পরে আমাদের দিকে তাকাইয়া অদ্ভুত কায়দায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বৈসাকবাবু কি বোলছে ব্রাদার ?'

'বোলছে, তোর বাপের মাথা গুয়োটা।' বলিয়াই হাত দুখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া তিনি ঝাঁকাইতে লাগিলেন।

সেই অদ্ভুত ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবও খুব হাসিতে লাগিল। বসাক মহাশয় শরৎবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভাখ ভাখ চাটুয্যে, তুমি ত এত ছবি-টবি আঁকো, একবার এই ল্যাজারো সাহেবের একখানা ছবি আঁকো না কেন ? বেশ বাঁদরটার মতন দেখতে হবেখনি। তা ল্যাজারো নামটা ঠিকই হয়েছিল ! ল্যাজ নেই এই যা দুঃখু। ভগবান ঐখানটায় ভুল করেছেন।'

'চুপ করো না বসাক। মানুষকে অমন করে বলতে আছে কখনো।'

'কেন বলতে নেই চাটুয্যে ! কোথাকার বদ্ধ পাগল, ওকে আবার ব্রাদার ব্রাদার করে তোমরা মাথায় তুলে নাচো। ছ্যাঃ'—বলিয়াই বসাক মহাশয় নাকমুখের এমন অদ্ভুত ভঙ্গী করিলেন, যেন সত্য-সত্যই তাঁহার নাকে কোন দুর্গন্ধ গিয়া ঢুকিয়াছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! সাহেব বসাক মহাশয়ের সঙ্গে তেমনি ভাবেই হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বসাক মহাশয় হেন লোক, যিনি মনুষ্যত্বের নিম্নতম সোপানে নামিয়া গিয়াছেন, তিনি কেমন অম্লানচিত্তে আমাদের কাছে কেবলই বাহাদুরী দেখাইতে লাগিলেন।

অফিস ফেরত চারজনেই কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর অগ্রসর হইলাম। পরে একটা রাস্তার মোড় ঘুরিতেই সাহেব বিদায় লইল। আমিও আমার বাসার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। শরৎবাবু বসাক মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া, 'গুড-বাই ব্রাদার, আসি হে সরকার।'—বলিয়া সেদিনকার মত বিদায় লইলেন।

॥ চার ॥

শরৎচন্দ্র কি প্রকৃতির লোক তাহা বহু আয়াসেও প্রথমটায় বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বঙ্গচন্দ্রের অসুখের সময় তাঁহার অক্লান্ত বন্ধুসেবা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, খাঁটি মানুষটা কোথায় এতদিন আত্মগোপন করিয়াছিল।

শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁহার ফাইন আর্টস সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিয়া পাশের বাড়ীর দিকে গলা বাড়াইয়া ডাকিলেন, 'ওহে সাধু ঘরে আছ?'

'কে দাঠাকুর নাকি?' বলিয়া একটা কাঁচা-পাকা গোছের লোক মাথায় লম্বা চুল—মুখে লম্বা দাড়ি—ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন দরকার আছে?'

'আছে বৈ কি। কিছু চা-টা আনিয়ে দিতে পার দোকান থেকে?'

'তা আর পারি নে! কি চাই বলুন?'

'এই চা, আর কিছু রুটী টোষ্ট। এই পয়সা নাও—' বলিয়াই একটা সিকি তাহার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন।

অবিলম্বে গরম চা ও টোষ্ট আসিয়া হাজির। শরৎবাবু সাধুর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'কিছু হোক না সাধু?'

সাধু জিভে কামড় দিয়া গলার ত্রিকণ্ঠী দেখাইয়া বলিল, 'এখনো গুরুর নাম জপা হয় নি! বিশেষতঃ ও মোছলমানের দোকানের রুটী-চা।'

শরৎবাবু ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তাই ত হে! সাধু-মানুষ হয়ে কুলীন বামুনের জাতটা মারলে সকাল বেলাই।'

লোকটা ঈষৎ অপ্রতিভের মতন জবাব করিল, 'তা ত জানতাম না দাঠাকুর। দেখতে পাই পথে-ঘাটে সবাই ওই চাচার দোকানের চা রুটী থেকে সুরু করে

কত কি আস্ত তাজা ঝোলানো থাকে, তা অবধি সেবা করে থাকেন।'

'তা ত করেন সাধু। যদি বামুন বলে আমার ওপর এতটুকুও ভক্তি-ছেদ্দা থাকে ত, একটুখানি নয় পেসাদ পেয়েই গেলে।'—বলিয়াই দুই টুকরা রুটি টোষ্ট ও এক পেয়ালা চা সাধুর সুমুখে ধরিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য এবার আর সাধুর ইষ্টমন্ত্র জপের বা ত্রিকণ্ঠীর কোন দোহাই শোনা গেল না। বেশ নিবিষ্ট চিত্তে চা ও রুটি সেবা করিয়া দাঠাকুরকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল।

শরৎবাবু আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'সাধু সেবা দেখলে একবার সরকার?'

উত্তর করিলাম, 'তা ত দেখলাম শরৎদা! কিন্তু লোকটা কে?'

তিনি কহিলেন, 'বাড়ী ভদ্রক জেলায়। ছিল বাংলা মুলুকে এক ভদ্র-লোকের বাড়ীতে চাকর। সেখানে কি সব অভদ্রের মত কুকাণ্ড করে ঠেলা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে।'

'কি করে এখানে?'

'বম্বে-বর্ম্মা ট্রেডিং কোম্পানীর কারখানায় কাজ করে। লোকটা একজন ভাল ফিটার। আজ কদিন শরীর খারাপ ব'লে ছুটি নিয়েছে।'

'খারাপের ত কোন লক্ষণ দেখলাম না শরৎদা।'

'সে কি আর দেখতে পাবে? শনিবার সন্ধ্যা-বেলায় ঘাড়ে ভূত চাপে, দু তিন দিন তার জের চলতে থাকে। এবার আমাকে দিয়ে দরখাস্ত লেখাতে আনলেই আমি বলেছি, হুঁসিয়ার সাধু। সামনের শনিবার এবার যদি সেটা চালাবে ত আমি নিজে গিয়ে তোমার সাহেবকে বলে তোমার চাকরীটা খতম করে দেব, বুঝতে পারছ ত? বলে ত গেছে—নানা রকম দিব্যি করে—যে ও জিনিষটা ওর পিতৃ-মাতৃ রক্ত। দেখাই যাক না পিতৃ-মাতৃ রক্তের সম্মান কতদূর কি রক্ষা করে ওঠে।'

আমি একটুখানি আশ্চর্যের সঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, 'শরৎদা, আপনিও

যেমন, খেয়েদেয়ে আর দুনিয়ায় কাজ নেই, তাই এই হতভাগাদের মধ্যে আড্ডা গেড়েছেন।'

বুঝিতে পারিলাম না, আমার এই নির্মম উক্তির জন্যই কি শরৎদার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। বলিলেন 'ওহে সরকার, ওরা যে হতভাগা সে কথা একশ বার সত্যি। (তবু ওরাও ত মানুষ। ওদের ভাল না করে যদি আমরা দূর দূর করে ওদিকে তাড়িয়ে দিই ত, ওরা যে দূরেই থেকে যাবে।')

পরে সহজ গলায় বলিলেন, "আর এক কথা, আমার এমনি নিরিবিলি জায়গায় থাকতেই ভাল লাগে। দিব্যি সামনে ধূ ধূ করছে মাঠ। আমার ছবি আঁকবার বেশ সুবিধা হবে এখানে, কি বল ?'—বলিয়া নিজের প্রশ্নে নিজেই মনের আনন্দে হাসিতে লাগিলেন।

বৎসরটি ঠিক মনে নাই, খুব সম্ভব ১৯০৯ সালের প্রায় মাঝামাঝি সময়টা হইবে। তখন আমি শরৎবাবুর বাসায় প্রায় ফি রবিবারেই একবার করিয়া যাইতাম। এক রবিবার গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কই শরৎদা, সাধু এখন আসে-টাসে না ?'

তিনি উত্তর করিলেন, 'না হে সরকার। তার আর আসবার দরকার পড়ে নি।'

'তা হলে ত আপনার হাতযশ আছে দেখছি !'

বলিতেই তিনি একটু চোখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'তাহলে বোঝ ভায়া আমার কেরামতি। এখন দেখবে সাধুকে একবারটি ত এস।'—বলিয়াই আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বারান্দায় লইয়া গেলেন। পরে সাধুর বাড়ীর দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এইবার ছ্যাখ সত্যি মিথ্যে।' দেখিলাম, সাধু বারান্দায় পূর্ব মুখ হইয়া চোখ বুজিয়া গলবস্ত্রে যোড়হাতে দাঁড়াইয়া আছে।

মুহূর্ত কাল মধ্যে সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইতেই শরৎবাবু তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কি হে সাধু, কুশল ত ?'

সাধু এই আকস্মিক প্রশ্নে প্রথমটায় আচম্‌কার মতন একটুখানি আমাদের দুজনের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে কপালে দুই হাত ঠেকাইয়া গলবস্ত্র অবস্থায়ই বলিয়া উঠিল, 'এই যে দাঠাকুর। প্রাতঃ প্রণাম।'

শরৎবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'বলি ভাল আছ ত হে সাধু?'

'আজ্ঞে তা আপনার আশীর্বাদে একরূপ আছি বই কি?'

শরৎবাবুও একটুখানি ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া টিপ্পনি না কাটিয়া ছাড়িলেন না। কহিলেন, 'এবার তাহলে আর পিটিশান লেখার দরকার হবে না, কি বল সাধু?'

'রামচন্দ্র! কি যে বলেন দাঠাকুর'—বলিয়াই দাঠাকুরকে পূর্ববৎ আবার একটী প্রণাম করিয়া বোধ হয় এইরূপ অপ্রীতিকর প্রশ্নের হাত এড়াইবার জন্যই সে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

শরৎবাবু এবার আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দেখেছ হে সরকার! সাধু কেমন আমাকে জব্দ করে চলে গেল।'

আমি সংক্ষেপে উত্তর করিলাম, 'হ্যাঁ জব্দই বটে।'

'জব্দ নয়, একশ বার জব্দ বলে একে?'—পরে গলার স্বর নামাইয়া নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, 'তা জব্দ করুক, তবু ভাল হলেই হল।'

এমন সময় ক্ষুদ্র কাঠের সোপানের উপর ঠকঠক শব্দ শোনা গেল। তাকাইয়া দেখি, এক পক্ককেশ শীর্ণদেহ জীর্ণ বেশ বৃদ্ধ লাঠির উপর ভর রাখিয়া রেলিং ধরিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে উঠিতেছে। তাহার মাথার একগাছি চুল কিম্বা মুখের একগাছি দাড়ি কোথাও কাঁচা নাই। এই তুষার-শুভ্র-মস্তক বৃদ্ধটীকে দেখিয়া আমি একটুখানি কেমন আড়ষ্টের মতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু শরৎবাবু শশব্যস্তে আগাইয়া গিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া আনিলেন। বৃদ্ধ অতি কষ্টে ভূমিষ্ঠ হইয়া শরৎবাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'সকাল বেলা উঠে মনে করলুম, যাই একবার দেবতার পায়ের ধূলো নিয়ে আসি। শুনে এরাও বললে, আচ্ছা এসোগে পায়ের ধূলো নিয়ে।'

'এরা আবার কে বল ত নারদ মুনি? এই না বললে সেদিন যে তুমি যাঁর 'সবে ধন নীলমণি' ছিলে, তিনি আজ তিন বছর হল পেলেগে স্বর্গারোহণ করেছেন। আবার এরা এল কোথা থেকে হে?'

'আজ্ঞে—আজ্ঞে দেবতা, এই তেনার কথাই বলছিলুম আর কি?'—বলিয়াই প্রকাণ্ড ঢোক গিলিয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

'হ্যাঁ হে আবার নতুন করে ঘর সংসার পেতেছ নাকি?'

বৃদ্ধের চোখ দুইটী এই অভিনব প্রশ্নে রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মত জ্বল-জ্বল করিয়া উঠিল। কোটরের ভিতর হইতে যথাসম্ভব তারকাদ্বয়কে ঊর্ধ্ব দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'কি বললেন দেবতা? আর কি সে যৌবনকাল আছে যে, ওসব গলগ্রহ জোটাব। হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে ছেল বটে একদিন, যখন এই নারদেরও যথেষ্ট কদর ছিল।' বলিয়াই সে কতকটা অন্যমনস্কের মতন মুখ ফিরাইয়া রহিল।

শরৎবাবু চিরদিনই রহস্যপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু এই রহস্যের অন্তরালে তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর সহানুভূতি নিহিত ছিল, তাহা যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে কদাচ না আসিয়াছে, তাহারা বুঝিতে পারিবে না। বৃদ্ধকে বলিলেন, 'আচ্ছা নারদ, আজ দুপুরে আর ঘরে গিয়ে কাজ নেই, আমার এখানেই যা হোক দুটী প্রসাদ পেয়ো'খন।'

বৃদ্ধের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা মুহূর্তের মধ্যে তাহার চোখে মুখে যেন প্রকাশ পাইয়া উঠিল। লোকটী যে কত বড় দুর্ভাগা, তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না।

'তামাক খাবে?' বলিয়াই শরৎবাবু হুঁকার উপর হইতে কলিকাটী তাহার সম্মুখে নামাইয়া দিলেন। এই বয়সেও দুই হাতের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যেরূপ ভাবে সে কলিকায় টান দিতে লাগিল, ইহাতে বয়সকালে সে যে এ জাতীয়ই আরেকটু বড় রকমের নেশায় অভ্যস্ত ছিল, এরূপ অনুমান করা গেল। শরৎ-

বাবুর কাছে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে ইঙ্গিতে কথাটা উত্থাপন করিতেই তিনি একটুখানি হালকা হাসি হাসিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আসন্ন হাসিটাকে সংযত করিয়া ভারী গলায় কহিলেন, 'ওহে সরকার, এ লোকগুলোর কোনটা বাদ যায় বলত দেখি? নেশা বলতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি আছে, সবগুলি হজম করে এই বুড়ো সর্বস্বান্ত হয়ে বদহজমীতে ভুগতে থাকে, আর পথে পথে দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে নিজের দুর্বহ জীবনটাকে আরও দুর্বহ করে তোলে। বেচারী একদিন আমাকে ওর নিজের জীবনের যা ছোটখাটো একখানি ইতিহাস বললে, তা যদি সত্যি হয় ত ভাই, তোমাকে বলছি লোকটি যথার্থই ভগবানের দয়ার পাত্র। ভালবেসে কেউ কোন দিন যদি ফতুর হয়ে থাকে ত এই বেচারী। পরিবার ছিল, পুরুত ডেকে শাঁখ বাজিয়ে মন্ত্র পড়িয়ে বিয়ে করা পরিবার কি না তা ও-ই জানে আর ওর অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু তা যাই হোক তাকে কোন মন্ত্রপূত পরিবারের চেয়ে যে ও কম ভালবাসত এমন কথা কস্মিনকালেও শুনি নি। কি বলব সরকার, সেই পরিবার গেল সেবারে পেলেগে মারা, বেচারারও গেল মাথা খারাপ হয়ে। ডাক্তার খরচাই কি লোকটার কম হল। সেও ৩০০৲/৪০০৲ টাকার কম হবে না। তাও যদি পরিবারটী রক্ষা পেত ত কথাই ছিল না। এতেই ত বলতে চাই সত্যি সত্যিই ও ভগবানের দয়ার পাত্র। কেননা তিনিই যখন মেরেছেন, তখন রক্ষাও তিনি করবেন। নইলে জগৎসংসার চলবে কি করে বল ত?'—বলিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

পরে তিনি ভিতরে গিয়া চা লইয়া আসিলেন। আমাদের সঙ্গে বৃদ্ধটিরও এক পেয়ালা গরম চা জুটিয়া গেল। চা পান সমাধা হইলে শরৎবাবু বৃদ্ধের পানে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'গ্যাখ নারদমুনি, যখন যা দরকার হয়, আমার এখানে এসে জানিও। এতে যদি কিছু মনে কর ত, সে আমি কখনও মাফ করতে পারব না। যদি কোন দিন শুনতে পাই, যে তুমি অনাহারে আছ, তাহলে স্পষ্ট বলে রাখছি, আজ থেকেই আমার চৌকাঠ মাড়িও না।'

শরৎবাবুর এই সস্নেহ অথচ তীব্র তিরস্কারে নারদমুনি আনন্দে গদগদ হইয়া কহিল, 'এমন কথাও কখনও হতে পারে দেবতা, যে না খেয়ে থাকব আপনি হেন দয়াল ঠাকুর আমার হাতের কাছে থাকতে, রামচন্দ্র !'

'যখন যা খেতে ইচ্ছে করে, অম্লানচিত্তে এসে জানিয়ে যেও, ব্যস। এত লোহা লক্কড়, কল কব্জার শক্ত শক্ত কাজই করতে পেরেছ, আর এই সহজ কাজটুকুই পারবে না ?'—বলিয়া শরৎবাবু আপন মনে তামাক সেবন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ আরেকবার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দেবতার পানে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

(শরৎবাবু কহিতে লাগিলেন, 'দ্যাখ সরকার, পাপটাকে আমরা চিরকালই ঘৃণা করে আসছি, অবশ্য করাও উচিত। কেননা সংসারে ভাল বলে যেটা বুঝতে পাচ্ছি, সেটা যদি সত্যকার ভালই হয় ত, তার মূলে পাপের সংশ্রব যে কস্মিনকালেও ছিল না, বা থাকতে নেই, এমন কথা আমি ভুলক্রমেও বলছি নে। কিন্তু সেই পাপের চেয়ে পুণ্যের ভাগ হয়ত তার মধ্যে এত বেশী ছিল, যে সেটার থই পাওয়া যায় না। এই যে লোকগুলো, এরা যে মানুষ, সে কথাটা যখন ভুলে গিয়ে নানা রকম অমানুষিক কাণ্ড করে বসে, তখন যদি আমার চোখের ওপর তুমি এদের গুলি করেও মার ত আমার এতটুকু দুঃখ হবে না। শনিবার এলেই ব্যাটাদের ঘাড়ে ভূত চেপে বসে। সে ভূত আর সহজে নামে না। ভদ্র ঘরে হলে ঘরের যারা লক্ষ্মী, তাদেরই মাহাত্ম্যে অনেক সময় ভূত ছেড়ে যায়। তবে সেখানেও এমন সব ভূত যে না আছে এমন নয়—বিস্তর আছে। বরং এদের চাইতেও বড় বড় ভূত ভদ্র পরিবারে আছে। সেখানে ঘরের লক্ষ্মী ত দূরের কথা, স্বয়ং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও এসে যে কিছু করতে পারবেন না একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। তবে এদের আবহাওয়াটাই বড় কলুষিত। স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে মিলে যে সব পৈশাচিক কাণ্ড করতে থাকে, তা স্বচক্ষে না দেখলে বলে বোঝাবার জো নেই। ধর, আমার এপাড়ায় ত কেবল ঐ একা

সাধুই বাস করে, ওর আর ওর পরিবারের কাণ্ড-কারখানা যদি একবারটী দেখতে ত আমার কথার প্রমাণ পেতে। যেমনি সাধু তেমনি সাধুর পরিবার। এ বলে আমাকে গ্যাখ, ও বলে আমাকে গ্যাখ। ভগবান কি যুগলই মিলিয়েছেন। তবু গ্যাখ এদের কি তুমি কখনো ঘৃণার চোখে দেখতে পার?'

'কেন তাতে দোষ আছে কিছু?'

'না হে সরকার, তা পার না। ভাল অবস্থায় থাকলে এরা নিজেদের স্বরূপটা খুব ভাল করেই বোঝে, আর সেই জন্যেই ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন বনিবনাও করে চলে। তাদের দেখলে অবাক হতে হয়। কথায় কথায়ই বলে, আমরা হলুম মশাই 'লোহা-কাটা' আর আপনারা হলেন 'ভদ্দর লোক'। আপনাদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা? কিন্তু এরাই যখন জ্ঞান হারিয়ে পশুর মত কাজ করতে থাকে, তখন আর কি বলব, ঐ যে বললুম গুলি করে মারার কথা, তাই করতে ইচ্ছা হয়, তাতে এতটুকুও দুঃখ হয় না।'

'সত্যিই দুঃখ হয় না শরৎদা?—কি বলছেন আপনি এসব?'

'না হে সরকার, এতটুকু দুঃখ হয় না। তোমার ভাই কি ছেলে যদি পশুর মতন কাজ করে ত, তোমার কি করতে ইচ্ছে হয় বল ত?'

'কি করে বলব শরৎদা!'

'বলতে পারলে না? ইচ্ছে হয় না কি, যে মানুষ হয়ে জন্মে পশুর মত কাজ করেছে, সে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া শতগুণে সহস্রগুণে শ্রেয়?'

'কিন্তু এরা কে শরৎদা?'

'মনে কর আমাদেরই জাত ভাই। লেখাপড়া শেখে নি, তাই ওদের এই অধঃপতন। কিন্তু যদি শিখিয়ে পড়িয়ে গড়িয়ে পিটিয়ে মানুষ করে নেওয়া যায় ত, ওরাই বা আমাদের চেয়ে কম কিসে? বলতে চাও সদ্‌গোপ কৈবর্তের ছেলে একেবারেই ছোট জাত? মেদিনীপুর অঞ্চলের বেশীরভাগ লোকই সদ্‌গোপ ও কৈবর্ত। তাই বলে তাদের ভেতর যে একেবারে শিক্ষিত লোক নেই এমন কথাও ত বলতে পার না। তাহলেই ধর, জন্মের দরুণ কেউ ছোট জাতের

ছেলে হলেই সে ছোটলোক নয়। জাতি আর লোক এক নয়। জাতির দোহাই-এর জোরে কাউকে মনুষ্য সমাজে বড় রকমের সার্টিফিকেট দেওয়া চলে না। তাহলে আমাদের সনাতন ভারতবর্ষের শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা। সর্বান্তর্যামী ভগবান সূক্ষ্মরূপে নিখিল চরাচরে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন। সামান্য কীটপতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে আচণ্ডাল দ্বিজ—সমস্তের মধ্যেই তিনি আছেন জীবাত্মা রূপে। সুতরাং, তোমার আমার এ নিয়ে বিচার বিতর্ক করাই অন্যায়।'

আমি তাঁহার এই বক্তৃতায় অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'তা হলে আপনার বিচারে দুনিয়ার সবাইকেই মাথায় করে নিয়ে নাচতে হবে?'

'সে কথা আমিই কি বলচি? মানুষকে কোনো অবস্থায়ই ঘৃণা করতে নেই, এইটুকুই হচ্ছে আমার বক্তব্য। মন্দ দেখলে শুধরে নেবার চেষ্টা করতে হবে। এইটেই হচ্চে একটা খুব বড় রকমের কাজ। কেননা, এই মানুষই ভগবানের রাজ্যে একদিকে যেমন প্রবল, অপর দিকে তেমনি দুর্ব্বল। বেশীদূর যাবার দরকার নেই, যদি কোনদিন সোমবার সকালবেলা এদিকটায় আসতে পার ত দেখতে পাবে, যা বললুম তা সত্যি না মিথ্যে। ঘাড়ের ভূত যখন ছেড়ে যায়, তখন ভাবনা হয় সংসারের। গরহাজিরীর দরুণ যদি সাহেব চাকরী থেকে বরখাস্তই করে দেয় ত, তখন উপায়। নিদেন পক্ষে মাইনে কাটলে কিম্বা জরিমানা করলেও ত ওদের পক্ষে কম লোকসানের কথা নয়। তখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি যে, কিরূপ মনের অবস্থা নিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে ওরা আমার কাছে ছুটে আসে দু লাইনের সামান্য একখানা দরখাস্ত লেখাতে, তখন কি আর ভুলক্রমেও মনে পড়ে ওদের ব্যবহারের কথা। তখন কেবলই মনে পড়তে থাকে, হায় ওরা কত বড় নিঃস্ব, কত বড় অসহায়।'—বলিতে বলিতে শরৎ-বাবুর চক্ষুদ্বয় আবার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

একদিন তিনি বিষণ্ণ মুখে আমার কাছে কহিলেন, 'ওহে সরকার, সেই বুড়োটা মারা গেছে হে।'

'কোন্ বুড়ো শরৎদা ?'

'ওই যে সেই, যাকে নারদমুনি বলে ডাকতুম। বেচারা আজকাল আমার ওখানে বড় যেত না। যেখানে সেখানে বারো জাতের কাছে চেয়ে চিন্তে খেত।'—বলিতে বলিতে একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার ভিতর হইতে প্রবল বেগে বাহির হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে দরবিগলিত ধারে অশ্রু তাঁহার গণ্ডযুগল বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।) আমি চুপ করিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলাম—অনাবিল হাসির মধ্যে এত অশ্রুও সঞ্চিত থাকে কারো।

এক্‌জামিনারের অফিসে দাদামশায় বাদে সাবেকী আমলের আরেকজন উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসাক—ওরফে মিঃ টি. এন্. বৈসাক। কোন মান্ধাতার আমলে যে এই মিষ্টার বৈসাক জন্মভূমির স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া বর্মামুলুকে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছিলেন, সে কথা কেহই বলিতে পারে না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সময় অনেক রকম জবাব পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার দেশের পরিচয় সম্বন্ধেও কেহ কিছুই জানিত না।

এই বসাক মহাশয় সারাজীবন ধরিয়া দারিদ্র্যের সঙ্গে যে কত লড়াই করিয়া-ছেন এবং বিজয়লাভের আশায় কত ফন্দী যে আঁটিয়াছেন তাহা আর একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্মায়, ভারতবর্ষে, বিলাতে যত রকম লটারী খেলা আছে, সবগুলিতেই বছর বছর কেবল কপাল ঠুকিয়া টাকাই ঢালিয়া আসিয়া-ছেন। কাজের বেলায় যত সব অপয়া ঘোড়াই ইঁহার নামে উঠিয়াছে। কখন কখন এমনও দেখা গিয়াছে যে সামান্য মাত্র দু-এক নম্বরের তফাতে একজন হয়ত প্রথম পুরস্কারটী পাইয়া গিয়াছে। ইহাতেই এই ব্যক্তির কি আনন্দ। 'ওহে দেখেছ হে! সামান্য দুটো নম্বরের তফাৎ, নইলে মেরে দিয়েছিলুম আর

কি! আচ্ছা দেখা যাক্ ত সামনের বারে।'

বছরের পর বছর ধরিয়া ইনি কেবল চিরজীবন দেনার বোঝাই টানিয়া আসিতেছেন। সে দেনার জের এখনও মেটে নাই, তাই এত বৃদ্ধ বয়সেও বেচারীকে একজামিনার অফিসে 'কেঁচে গণ্ডূষ' করিতে হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাই, 'কি করব ভাই। পেন্সেনের টাকা কটিতে চলে না।'

দেশের পরিবারটি যখন পিত্রালয়ে মর মর, তখন আত্মীয়স্বজন যারা দেশে ছিল, তারা তারের উপর তার করিয়া মহাপুরুষকে টলাইতে পারিল না, বর্মায় এমনি ইঁহার শিকড় বসিয়া গিয়াছিল। অবশেষে যখন হতভাগিনী চির-জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া ইহলোক ত্যাগ করিল, তখন বিবেক বলিতে যদি এ ব্যক্তির কিছু থাকে ত তারই আঘাতে, মনটা একটু নড় চড় হইয়া উঠিল। শরৎবাবুপ্রমুখ বন্ধুবর্গ তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ক্রমাগত পরামর্শ দিতে লাগিলেন, 'আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে। এই বারে ভাল চাও ত এই মগের মুলুক থেকে সরে পড়, হয় কাশী কি বৃন্দাবন গিয়ে শেষ জীবনটা একটুখানি শান্তিতে কাটাবার চেষ্টা ছাখ।'

শরৎবাবুই অগ্রণী হইয়া তাঁহার দেনার একটা আন্দাজ করিয়া পরিশোধ করিবার পরামর্শ দিয়া দিলেন। কথা হইল, ফি মাসে ইনি দেনা বাবদ শরৎ-বাবুর নামে কিছু কিছু পাঠাইয়া দিবেন। পরামর্শ চূড়ান্ত হইলে, একদিন আমরা চুপি চুপি তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলাম।

পক্ষকাল গত হইতেই দেখি কি—মহাপুরুষ সশরীরে আসিয়া উপস্থিত।

শরৎবাবু চোখ দুটি কপালে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বসাক যে হে! বলি কাশীর কদ্দূর?'

'আর কাশী! তুমিও যেমন চাটুয্যে, এই আমার কাশী, এই আমার বৃন্দাবন। আর কাশী কাশী যে কর সব তোমরা, সেখানে কি আছে বল ত? সেখানে যেমন বাবা বিশ্বেশ্বর আছেন, এখানেও তেমনি বাবা বুদ্ধদেব আছেন। সেখানেও গঙ্গা, এখানেও ইরাবতী। বরঞ্চ সেখানে গুণ্ডার আড্ডা—

কথাটা সমাধা না হইতেই শরৎবাবু অমনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'গুণ্ডা তোমার এখানেই বা কম কিসের? বরঞ্চ সেটা তীর্থস্থান, সেখানে যদি গুণ্ডার হাতে প্রাণও যায় তাতেও মস্ত লাভ। বুঝতে পারছ না, কাশীতে ম'লে বিশ্বেশ্বর লাভ হয়। ওহে বসাক! হিন্দু হয়ে এই সোজা কথাটা একবার তলিয়ে দেখলে না। মিছি মিছি আবার মরতে এলে এই বর্মায়। কাশী হেন তীর্থস্থানও কেউ স্বেচ্ছায় কখনো ত্যাগ করে?'

'তা'ত করে না হে! কিন্তু ওই যে বললুম—'

'হ্যাঁ বুঝেছি'—বলিয়াই শরৎবাবু নীরব হইলেন।

আসল কথাটা হইতেছে, বেচারী অর্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে সেই যে রেঙ্গুন আসিয়াছে, সেই হইতেই এইখানেই একভাবে দীর্ঘ-জীবন কাটাইয়া দিয়াছে, এক পাও আর কোথাও নড়চড় হয় নাই। এই রেঙ্গুন সহরেই বহুবার পত্নীপুত্র বিয়োগ হওয়াতে বেচারীকে একেবারে কাহিল করিয়া ফেলিয়াছে। মানুষের জীবনে এ যে কত বড় অশান্তি তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের বুঝিবার সাধ্য নাই। তাই এই মাটির মায়া কাটাইয়া বৈকুণ্ঠে যাওয়াও বোধ হয় এ ব্যক্তির কাছে লোভনীয় নয়। শরৎবাবু ইঁহাকে বহুবার সুপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেরূপ করিতে হইলে বেচারীকে যে কতখানি কষ্ট দেওয়া হয়, তাহার প্রমাণ কাশী হইতে ফিরিয়া আসিতেই শেষটায় টের পাওয়া গেল।

বসাক মহাশয়ের আস্তানাটি আমরা কোনদিনই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। একদিন শরৎবাবুর মুখে শুনিতে পাইলাম যে, তাঁর বাসার কাছাকাছি একটা বস্তিতে বসাক থাকেন। তিনি বলিলেন, 'হাজার হোক্, বাঙ্গালী হয়ে যে কষ্ট সহ্য করে থাকতে পারে, এ ভাই আমি না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। একবারটি আমার বাসায় যাবার সময় রেল রাস্তার ডাইনে খাদের দিকে তাকিয়ে দেখো। ও লাইনে ওই হল শেষ ঘর। তোমরা যে হাজার চেষ্টাতেও ওর বাড়ীঘর আবিষ্কার করে উঠতে পার নি, তার কারণই হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। যাই

বল তোমরা, আমার কিন্তু দেখে ভারি কষ্ট লাগে। কি যে কদর্য খাওয়া-পরা, এ যদি একবার স্বচক্ষে ছাখ ত প্রমাণ পাবে, শরৎদা সত্যি বলছে কি মিথ্যে বলছে। সক্ষম মানুষ যে এমন করে নিজেকে পরিবারের হাতে সঁপে ছায়, এ আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি। বাপরে! পরিবার ত আছেনই সাক্ষাৎ চামুণ্ডা, তারপর তাঁর মা আছেন, বাবা আছেন, ভাই বোন আছেন। দেনা শোধ, দেনা শোধ—যে কর, দেনা স্বয়ং কুবের এসেও শোধ করতে পারবেন না। ওহে সরকার! সতীর দীর্ঘশ্বাস যাবে কোথায়? সে দীর্ঘশ্বাসের আগুনের হাওয়া ওর হাড়ে লেগে ওকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ত মারছেই, আরও মারবে। এখনি হয়েছে কি?'—বলিতে বলিতে শরৎবাবু নীরব হইলেন।

তখন আষাঢ় মাস। বৃষ্টির আর বিরাম নাই। সূর্য যে কখন উদয় হন, কখন অস্ত যান তিনিই জানেন। অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণে পথ-ঘাট পিচ্ছিল কর্দমাক্ত। এমনই দুর্যোগের সময়ে একদিন রবিবার সকালবেলা শরৎবাবুর বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প ছিল, বসাক মহাশয়ের আবাসের খোঁজ না করিলেই চলিবে না। সহর হইতে অনেকটা দূর। যে রাস্তা ধরিয়া যাইতে হয়, সেটি কাঁচা রাস্তা। কতকটা লোকজন ও যানবাহন চলাচলের জন্য, আর কতকটা রেল গাড়ীর জন্য। সারি সারি সাজানো স্লিপারের উপর সঙ্কীর্ণ রেলওয়ে লাইন, তার উপর দিয়া স্লিপারের ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলিয়া চলা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

ঘরটি চিনিতে বড় বিলম্ব হইল না। খানিকটা দূর যাইতেই শরৎবাবুর নির্দেশ মত যে ঘরটি চোখে পড়িল, সেটি যে বসাক মশায়ের সে খবর তার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যেই টের পাওয়া গেল। মোটের উপর ও পল্লীতে এমন এক-খানি শ্রীহীন কুটীর আর নাই বলিলেই হয়। পাতার ছাউনী, ঘরখানার সম্বলের মধ্যে আছে কেবল খুঁটী কয়টী এবং কাঠামোখানি! বহু কষ্টে সামনের বারান্দার সম্মুখে গিয়া দেখি কি, একখানি বাঁশের চাটাইয়ের উপর মহাপুরুষ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। না আছে মাথার নীচে একটা বালিশ, না

আছে বিছানাপত্রের আর কোন সরঞ্জাম। শিয়রের কাছে দেখা গেল, এক-খানা এনামেলের শান্‌কী ও একটি টীনের মগ। দুই তিনটি ছেলেমেয়ে ও জনদুই স্ত্রীলোকও দেখিতে পাইলাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে হাসিতে হাসিতে যাহা বলিল, তাহার সোজা অর্থ এই যে, বৈসাকবাবুর গত কাল হইতে শরীর ভাল নয়, তার উপর মাথাধরা। বলিয়াই, ইঙ্গিতে পাড়ার যে কারণ দর্শাইল তাহা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

বুঝিলাম, এই জন্যই এত কষ্ট এ লোকটা সহ্য করিতে পারে। বৃষ্টির জলে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, মুখের কাছে মাছি ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে, তবুও কি সুগভীর নিদ্রা! সর্বাঙ্গ ভিজা দেখিয়া একজনকে লক্ষ্য করিয়া গায়ের জল মুছাইয়া দিতে বলিলাম। সে হো হো শব্দে হাসিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে বলিল, যে, বাবুটি বেশ আরামে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দিনভর এম্‌নিই থাক্‌, জাগালে কষ্ট হবে। আঃ, কি সহানুভূতি রে। ইহারাই আবার এ মহাপুরুষের অন্তরঙ্গ!

শরৎবাবুর কাছে গিয়া বলিতেই তিনি একটুখানি হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। পরে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'আর বল কেন ভাই ওর কথা। কতজনেরই যে ভূত ছাড়ালুম তা আর বলতে পারি না। শেষটায় দেখছি বসাকের কাছে ফেল মারতে হল। বুঝতে পারছ না, এ যে লেখাপড়া জানে, একে যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝায় কার সাধ্যি। আচ্ছা দেখাই যাক্‌ ত?' বলিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি সম্মুখের গম্ভীর আকাশের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া আকাশের মতই গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

শরৎবাবুর অঙ্কিত মহাশ্বেতার ছবিখানাকে সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, এমন সময় রাস্তার উপর হইতে শোনা গেল,—

'ওহে চাটুয্যে, ঘরে-আছ হে?'

'আরে কে ও, বসাক নাকি ? এসো এসো।'

ছবি হইতে মুখ তুলিয়া দেখি, লুঙ্গি-পরা, পায়ে বর্মা ফানা, খোলা গা, হাতে লাঠি স্বয়ং মিষ্টার বৈসাক আসিয়া সশরীরে আবির্ভূত। আমাকে দেখিয়াই একগাল হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আরে সরকার যে ? তুমি কতক্ষণ ?'

উত্তর দিলাম, 'এই হল কতক্ষণ।'

'বেশ বেশ। মাঝে মাঝে এদিকেঁ বেড়াতে এস হে। বেশ খোলা জায়গা।'

খোলা জায়গার উল্লেখে বহু কষ্টে হাসি চাপিয়া যাইতে হইল। প্রত্যুত্তরে কহিলাম, 'হাঁ জায়গা আর মন্দ কি বসাক মশাই, তবে কি না—' বলিয়াই চুপ করিয়া গেলাম।

শরৎবাবু আমার দিকে তাকাইয়া একটুখানি হাসিয়া ফেলিলেন। পরে বসাক মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'আমি আশ্চর্য হচ্চি বসাক, যে রবিবারের দিন এত সকালে তুমি কি করে এলে ? ছুটির দিন ত ন'টা দশটার আগে তোমার ঘুমই ভাঙ্গে না হে।'

'এলুম তোমার ছবি আঁকা দেখতে। বেশ এঁকেছ হে চাটুয্যে।'—বলিয়া বসাক মহাশয় ঢুলু ঢুলু চক্ষে ছবির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

শরৎবাবু পাল্‌টা জবাবের ছলে বলিয়া উঠিলেন, 'তাহলে কালি কলম কাগজ আনবো নাকি হে ?'

'কেন বল দিকিন চাটুয্যে ?' বলিয়াই বসাক মহাশয় জিজ্ঞাসু নেত্রে শরৎবাবুর দিকে তাকাইলেন।

শরৎবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'কেন সার্টিফিকেট দিতে হবে না ?'

'বটে বটে।'

'তবে কি ? কাগজপত্রে লিখে সার্টিফিকেট দিতে হবে। তার তলায় লিখতে হবে টি. এন. বসাক।'

'যা বলেছ চাটুয্যে। কিন্তু আমার সার্টিফিকেটের জোরেই যদি তোমার

ছবির বাজারে আদর হয়। সেকথা থাক ভাই! কি করা যায় একটা পরামর্শ দাও দিকিন। আর এ বেদের পল্লীতে পোষায় না চাটুয্যে! দিন রাত্তির কেবল কিলিবিলি। দুত্তোর! এ শালার জাতের ওপর একদম পিত্তি চটে গেছে। আর তিলাধও ভাল লাগে না হে!'

শরৎবাবু একটুখানি হাসিয়া জবাব দিলেন, 'কি হে বসাক। এমন সোনার দেশ, এদেশেও তোমার ভাল লাগে না! ভাল যদি নাই লাগে ত এই ৩০।৩৫ বছর এদেশে কাটালে কি করে হে?'

'দূর দূর! আর কাটানোর কথা বোলো না। এবারে সত্যিই বড্ড ঘেন্না ধরে গেছে এদেশের ওপরে।'

'লক্ষণটা বড় সুবিধের মনে হচ্ছে না হে বসাক। পছন্দসই জিনিষের ওপর অরুচি হলে কি হয় জানতো?'

'কি আর হয়? মারা যায়! তা আমি শালা কস্মিনকালেও মরব মনে করেছ? মলে ত দুনিয়ার আপদ চুকে যেত।'

'হঠাৎ আজকে এমন চটে গেলে কেন বল ত বসাক।'

প্রশ্ন শুনিয়াই বসাক মহাশয় দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, 'কেন চটব না? একশ বার চটব। হাজার বার চটব। ও শালার গুষ্টিশুদ্দোকে যদি নিপাত করতে পারি ত গায়ের ঝাল মেটে।'—বলিয়াই যে ভাবে যষ্ঠী আস্ফালন করিতে লাগিলেন, তাহাতে মনে হইল সত্য সত্যই তাঁহার মাথায় খুন চাপিয়াছে। কিন্তু গায়ের ঝালটি যে কিসের দরুণ তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারা গেল না।

শরৎবাবু অবস্থা দেখিয়া ধীরে ভাবে বলিলেন, 'দেখো হে নিপাত টিপাত করার কথা আর মুখেও এন না, তাহলে অবস্থা হবে উল্‌টো তা বলে দিচ্ছি। জানোই ত কথায় কথায় ছুরি মারতে এদের মতন আর নেই। তাই বল্‌চি, বেশী মাথা গরম না করে যতটা পার ঠাণ্ডা হয়ে থাকবার চেষ্টা কোরো। নইলে কোনদিন অপঘাতে প্রাণটা হারাবে।'

'বেশ বলেছ যাহোক্ চাটুয্যে! বন্ধুলোকের উপযুক্ত কথাই বলেছ এতক্ষণে। আমাকে করবে এমন দিনরাত ছকড়া নকড়া, আর আমি রইব বুঝি চুপ করে মুখটি বুজে। বলিহারী যাই তোমার যুক্তিকে। পেটে এত বিত্তে বুদ্ধি থাক্‌তে এমন পরামর্শটা যে আমাকে দিলে, এ কি ভেবে চিন্তে, না যা মুখে এল, অমনি জলের মত বলে ফেললে?'

'কি কোরব বসাক। বুদ্ধিটা যেমন খেলবে তেমনি ত যুক্তি দেবো। আচ্ছা, আমার যুক্তি পরামর্শ আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, তুমি বরং এখান থেকেই ভাল করে কোমরটা ভাল করে বেঁধে নিয়ে একবারে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে লেগে যাও। আমি না হয় বরং একটুখানি এগিয়ে দিয়েই আস্‌ছি। তারপরে ও-গুষ্টির যে যেখানে আছে, তাদের সমূলে যদি বিনাশ করতে পারো ত তোমার বীরত্বের কথা চিরদিন লোকের মুখে মুখে থেকে যাবে। কি বল? এ যুক্তিটা মন্দ হল?'

শরৎবাবু ও আমি বহু কষ্টে হাসি চাপিয়া গেলাম। ক্রমশঃ বসাক মশায়েরও খুনোখুনির উদ্যমটা অনেকখানি কমিয়া গেল দেখিয়া শরৎবাবু কাছে গিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি হে? হঠাৎই এমন কেন চটে গেলে বল ত?'

বসাক মহাশয় ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিলেন বোঝা গেল না, যেটুকু জোরে বলিলেন, সেটুকু হইতেছে, 'বুঝতে পাচ্ছ না? আগে আগে রবিবারে আমাকে এত সকালে কোথাও বেরুতে দেখেছ? এখন যে বেরোই এ কি সাধ বলতে চাও?'

দুঃখেরি কথা বটে। অশান্তিময় সংসারে উপদ্রবের মধ্যে নিরুপদ্রবে ডুবিয়া থাকার যেটি ওষুধ সেটিও যদি সপ্তাহে একটা দিন না মেলে ত ভাল মানুষের সংসারে থাকিয়া সুখ কি?

বসাক মহাশয়ের এই যে দুঃখের আক্ষেপ ইহাতে আমাদের কাহারও মন স্পর্শ করিল না। শরৎবাবু একটুখানি দুঃখমিশ্রিত হাস্যের সহিত কহিলেন, 'তোমার ত কিছুই বাদ যায় না বসাক। কত সস্তা গণ্ডার দোকান আছে,

যদি নেহাৎ না-ই সামাল দিতে পার ত সেখানে যাও। দেখো গাড়ি-টাড়ি চাপা প'ড় না! শেষে আবার অফিসসুদ্ধু জুটে দরখাস্ত করতে হবে, তোমার সদ্‌গতির জন্যে। সেটি বড় সুবিধাজনক হবে না।'

এরূপ স্পষ্ট জবাবে বসাক মহাশয় খুসি হইলেন কিনা, বলা যায় না—দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

শরৎবাবু তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চা-টা কিছুই হয় নি বোধ হয় এত বেলাতেও? আচ্ছা ব'স একটুখানি।'—বলিয়াই হাতের তুলি ও প্লেট নামাইয়া রাখিয়া ভিতরে গিয়া চা ও কিছু খাবার লইয়া আসিলেন।

বসাক মহাশয় একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, 'ব্যস রে! এরই মধ্যে চা, আর খাবার এনে হাজির করলে কোত্থেকে হে চাটুয্যে?'

'আগে খাও, পরে বলছি। খাবারটা কাল অফিস থেকে ফেরবার মুখে এনেছিলুম, আর চা-টার জন্যে ত রবিবার সকাল থেকেই উনুনে জল চড়ানো থাকে। এই ত সরকার প্রায় রবিবারই আসে। তা ছাড়া বিভূতিবাবু, ধীরেন-বাবু, নগেন দাস বলে একটি ছোকরাও মাঝে মাঝে এসে থাকে। আমাদের বিজয়ও দু-একদিন এসেছিল, আবারও আসবে বলেছে। আরেকটি রোগা-পানা চেহারার লোক বাড়ী চাটগাঁ অঞ্চলে, নাম যোগীন সেন—সেও আসতে চেয়েছে। তবে আমার ছবির খবর এরা কেউই জানে না, জানতেও দেব না এদের। কেননা এরা দেখলে হয়ত ঠাট্টা করবে। বিশেষতঃ বিজয়কে।'

'যা বললে চাটুয্যে। এই ত সরকার রয়েছে, আমি রয়েছি আমরা দুজন থাকতে আবার কাকে দেখাতে যাবে তোমার ছবি? মিছেমিছি বেণাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই; কি বল হে সরকার?'—বলিয়াই ঢুলু ঢুলু চক্ষে একবার আমার দিকে তাকাইয়া, তিনি চায়ের পেয়ালাটি আমার সামনে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, 'হোক না সরকার আর একবার।'

হাত যোড় করিয়া বলিলাম, 'সর্বনাশ! তাহলে মারা যাব বসাক মশাই?

'না হে সরকার! অমন দুর্লক্ষুণে কথা বল না। ওতে আমার বড্ড কষ্ট লাগে। থাক, ওর চেয়ে বরং—চাটুয্যে যখন সমাদর করে দিয়েছে তখন আমিই না হয়, যেমন করে হোক, ওর সম্মানটা রাখি। কি বল সরকার, কি বল হে চাটুয্যে?'

'আবার চাটুয্যেকে কেন বসাক? যা বলবার সরকারকেই বল। এসব জিনিস যদি তোমার একান্তই অখাদ্য হয় ত, আমি তোমাকে দিব্যি দিচ্ছি বসাক, খেয়ো না। জানি রবিবার ভাত পর্যন্তও তোমার ছোঁয়া নিষেধ। তাই যদি হয়, ত আমি তোমাকে নিয়ম ভঙ্গ করতে বলি নে।'

শরৎবাবুর কথায় এই শ্লেষটুকু উপলব্ধি করিবার মতন ক্ষমতা বোধ হয় তখন তাঁহার আদৌ ছিল না। তাই নীরবে ইহার আঘাতটুকু সহ্য করিয়া গেলেন, এবং নীরবেই তাঁহার সম্মানও রক্ষা করিলেন। কিন্তু ছবি দেখার দিকে আর তাঁহার তেমন উৎসাহ রহিল না। ক্রমাগতই কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সেই অবস্থায়ই ধীরে ধীরে যষ্টির উপর ভর করিয়া বহুকষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে একবার গা-মোড়া দিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া লইয়া টলিতে টলিতে যেমনি প্রস্থানের উদ্যোগ করিবেন, অমনি শরৎবাবু উঠিলেন—'না মলে আর বাঁচার উপায় নেই দেখছি। নেহাৎ হতভাগা লোক কি না। যাও এই দণ্ডে দূর হও। তবে, সাবধানে মর, গাড়ী চাপা পড়ে যেন অপঘাতে প্রাণ হারিও না।'—বলিয়াই হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চক্ষের পলকেই হাসিটি কোথায় মিলাইয়া গিয়া মুখখানাকে এমন গম্ভীর করিয়া দিয়া গেল যে, সেদিক পানে আর অধিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারিলাম না। বুঝিলাম বর্ষার সমস্ত মেঘ আজ ইঁহার মনের মধ্যে আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া গিয়াছে।

॥ পাঁচ ॥

শরৎচন্দ্র অধ্যয়নের জন্য গানের মজলিস্ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ার পর একদিন তাঁহার নিজের মুখেই শুনিলাম, যে মিত্তির সাহেব তাঁহার সঙ্গে ফিলজফি পড়েন। শরৎবাবু চিরদিন হারবার্ট স্পেন্সার-এর একনিষ্ঠ ভক্ত। ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার সিনথেটিক্ ফিলজফি-র মত সমস্ত বইগুলি তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন,—এখন উক্ত মনীষীর ডেস্‌ক্রিপটীভ সোসিঅলজি পড়িতেছেন এবং আবশ্যক মত নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছেন। হারবার্ট স্পেনসার-কে আমাদের মতন পণ্ডিত লোকে কপিল-কণাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াই হয়ত ক্ষান্ত হয়, পড়িবার মতন দুঃসাহসের পরিচয় কদাপি দেয় বলিয়া মনে হয় না। স্পেনসার-কে আমাদের মতন একজন কেরানী হইয়া শরৎবাবু পড়িয়া ফেলিয়াছেন এবং তাঁহার সমগ্র দর্শনশাস্ত্রকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, আশ্চর্যের কথা বটে!

মিত্তির সাহেবের সঙ্গে শরৎবাবুর একত্র বাস ও অধ্যয়ন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল একটি অনিবার্য কারণে। তখন সহরে ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। মিত্তির সাহেবের কুঠিতে হঠাৎ একদিন গুটিকতক ইঁদুর ভবলীলা সাঙ্গ করাতে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে এক মহাআতঙ্ক জন্মিয়া গেল। অগত্যা মিত্তির সাহেবকে বাধ্য হইয়া একটা ছোটখাট বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে শরৎবাবুকেও বাধ্য হইয়া একটি মেসে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। এই মেসে তাঁহার একজন পুরাতন বন্ধু অবস্থিতি করিতেন। বন্ধুটি খুব অধ্যয়নশীল। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্বেও তিনি মুহূর্তের জন্য পড়াশুনা বা আলোচনা ছাড়া নিষ্ক্রিয় থাকিতে ভালবাসিতেন না। ইংরাজীতে ইনি প্রবন্ধ লিখিয়া এখানকার কোন

কোন খ্যাতনামা কাগজের সম্পাদকের নিকট রীতিমত পারিশ্রমিক আদায় করিয়াছেন।

শরৎবাবু একদিন আমার মুখে রবিবাবুর 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি'-র কথা শুনিয়া নেহাৎ ছেলেমানুষের মতন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে সরকার? রবিবাবুর এই বইগুলো কোথায় পাওয়া যায়?'

প্রত্যুত্তরে কহিলাম, 'কেন যেখানে আর আর সব বই পাওয়া যায় শরৎদা।'

'আমাকে আনিয়ে দিতে পার?'

'সে আর পারব না কেন?'—বলিতেই শরৎচন্দ্র পকেট হইতে কয়েকটি পয়সা বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই নাও, আজই একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দাও, কিন্তু!'

আমি পয়সাটি ফিরাইয়া দিয়া কহিলাম, 'পয়সার দরকার হবে না, অমনিই হবে, আমি আজই লিখে দিচ্ছি।'

'অমনি হবে কি? তা হলে লিখে দরকার নেই।'

বুঝিলাম দাদা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এ ক্রোধ যে তাঁহার স্নেহেরই রূপান্তর, তাহা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। পুনরায় বাদ-প্রতিবাদ করিবার আর সাহস হইল না। সুতরাং পয়সা ক'টি বাধ্য হইয়াই লইতে হইল।

কিছুদিন পরে বই পাইয়া শরৎচন্দ্র মহা খুসি। এমন করিয়াই এই উপন্যাস দুইখানিকে তিনি পড়িয়া ফেলিলেন যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অম্লান চিত্তে উত্তর করিতেন, 'ওহে আমার মতন এমন করে রবিবাবুর বই বোধ হয় কেউ পড়ে নি। আমি বলে দিতে পারি কোন কথাটার পর ঠিক কোন কথাটা বইতে আছে।'

(অতঃপর শরৎচন্দ্র কিয়দ্দিবস খুব জোরসে নভেল পড়া শুরু করিয়া দিলেন।

আমাকে দিয়া এখানকার একটা বিখ্যাত ইংরাজী কেতাবের দোকান হইতে জোলা-র খান পাঁচ ছয় নামজাদা বই কিনিয়া লইলেন। কিছুদিন পরে পাঠ সমাধা হইলে আমাদের নব প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ক্লাবের লাইব্রেরীতে আমার হাত দিয়া বইগুলি দান করিয়া ফেলিলেন। আমাকে বলিলেন, 'ইংরেজী নভেলের মধ্যে ডিকেন্স আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে হেনরী উড্। বাংলায় ছেলেবেলায় বঙ্কিমবাবু ভাল লাগত, এখন বোধহয় রবিবাবুকে সবচেয়ে ভাল লাগে।'

শরৎবাবু এক সময় কয়েকটি মানসিক আঘাত পান, তারই ফলে 'চয়নিকা' হইতে শুরু করিয়া কয়েকখানা ভাল বই বেঙ্গল ক্লাবের লাইব্রেরীতে দান করেন। এই সময় মাঝে মাঝে সাহিত্য সভার কোন কোন সভ্যের সঙ্গে তিনি কোন কোন বিষয়ে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। যতদূর মনে পড়ে বন্ধুবর কুমুদ-নাথের সঙ্গেই তাঁর একদিন তর্ক বাধে। কুমুদনাথ মুক্ত কণ্ঠে রাস্কিন-এর জয়-গান করিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্র ডিকেন্স-এর ভক্ত। তিনিও মুক্ত কণ্ঠে ডিকেন্স-এর প্রশংসাচ্ছলে পাল্টা জবাব দিয়া বলিলেন, 'দেখুন কুমুদবাবু, রাস্কিন যে একজন খুব বড় লেখক, একথা কেউ-ই অস্বীকার করছে না। কিন্তু হাজার হলেও রাস্কিন যে একজন সমালোচক (ক্রিটিক), কিন্তু ডিকেন্স যে একজন সত্যকার স্রষ্টা—ক্রিয়েটর—একথা মানেন ত? রাস্কিন-এর মতন হয়ত আরও কত জন রাস্কিন জন্মাতে পারে। কিন্তু বলুন ত ডিকেন্স-এর মত আরেক-জন ডিকেন্স জন্মেছে, না ভবিষ্যতে জন্মাবে? এ যদি বিশ্বাস করেন ত বলতে হয়, শেক্সপীয়র, কালিদাসের মতন কবিও আবার এসে জন্মাবে? কজন কালিদাস শেক্সপীয়র এযাবৎ জন্মেছে বলতে পারেন?'

কুমুদনাথও ছাড়িবার পাত্র নহেন। প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, 'শেক্স-পীয়রের সঙ্গে তুলনা করতে যাব কেন? উচ্চাঙ্গের রচনায় রাস্কিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী তা জানেন?'

'সে হয়ত আপনার কাছে, আমার কাছে। কিন্তু ডিকেন্স ইউরোপ

আমেরিকায় কত আদৃত, তাঁর মৌলিক সৃষ্টির জন্যে। যদি শেক্সপীয়র অমর হয়ে থাকে ত ডিকেন্সও থাকবে, একথা আপনি-আমি জোর করে উড়িয়ে দিলেই হবে না।'

সমস্ত বাদ-বিতণ্ডার মীমাংসা হইল প্রফুল্লবাবুর মধ্যস্থতায়। তিনি বলিলেন, 'সমালোচনা চলে সমানে সমানে এঁরা দুজনে যখন দুই ধরণের লেখক, তখন এঁদের সম্বন্ধে সমালোচনা না করাই সঙ্গত। এতে কেবল কথা কাটাকাটিই হয়।'

সকল বাদ-প্রতিবাদের তখনই নিরসন হইয়া গেল। কিন্তু শরৎবাবুকে আমরা সাহিত্য সভায় আনিতে পারিলাম না।

একদিকে যেমন বন্ধুবান্ধবদের মহলে শরৎবাবু স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে লাগিলেন অন্যদিকে তেমনি গভীর মনোনিবেশের সহিত দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার এই দিককার পরিচয় জানিত না, তাহারা তাঁহাকে নিজেদের চেয়ে বড় মনে করিত না। কেন-না এই খেয়ালী মানুষটির কথাবার্তায় সময় সময় তর্কচ্ছলে যদি কোন তত্ত্বের কথা মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইত, সেটার উপর কেহই তেমন জোর দিত না। ইহাতে মনে হয়, হয়ত কথাটা কেহই ধরিতে পারিত না, নয় ত মনে করিত, আরে শরৎ চাটুয্যে ত! কি একটা বকে যাচ্ছে, যাক্‌গে।

॥ ছয় ॥

(কৈশোরে ও যৌবনের প্রারম্ভে আত্মীয় বন্ধুদের সহিত ভাগলপুরে সাহিত্য-চর্চার কথা ছাড়িয়া দিলে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের আরম্ভ এবং প্রসার বাঙ্গলার বাহিরে, বাঙ্গলা সাহিত্যের আবহাওয়ার বাহিরে, এই সুদূর ব্রহ্মদেশে। এইখান হইতেই তাঁহার বঙ্গবিশ্রুত নাম।) কিন্তু এত বড় যে সাহিত্যিক, তাঁহার পরিচয় আমরা কিছুই জানিতাম না।

মনে পড়ে একদিন শরৎচন্দ্র তাঁহার বাসায় আমাকে এক টুকরা লেখা কাগজ দিয়া বলেন, 'ওহে সরকার, তোমরা ত বাংলা পদ্য লেখ দেখি, আমার এইটুকুন কেমন হল? ভুল থাকলে সংশোধন করে দিয়ো।'

আমি ত অবাক! এমন-রূপেও মানুষ মানুষকে পরীক্ষা করিয়া অপদস্থ করে! দুই তিনবার খুব মনোযোগের সহিত লেখাটা পড়িলাম। বহু কষ্টে যে অর্থ বুঝিতে সক্ষম হইলাম, সে কথা না বলিলেও চলে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শরৎদা, এ কেমন পরীক্ষা আপনার? এ যে রবীন্দ্রনাথের রচনার মত বুঝতে বড় সময় লাগে! মনে হয় রবীন্দ্রনাথের লেখার পরেই আপনার লেখা।'

শরৎচন্দ্র আমার কথায় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'পরেই বটে সরকার! কিন্তু তফাৎ কেমন বুঝলে? যেন আকাশ ও পাতাল!'

আমিও হাসিতে হাসিতে বলিলাম, 'কেন, আকাশ ছেড়েই যে একেবারে পাতালের কথা মনে এল শরৎদা!'

'তা ছাড়া আর কি সরকার—রবিবাবুর লেখাও পড়ি, আর-আর সব লিখিয়েদের লেখাও পড়ি। কিন্তু নাম করতে হলে কাউকেই তেমন খুঁজে পাই নে।'—বলিতেই, আমি বঙ্গ-সাহিত্যের দুই একজন প্রখ্যাতনামা কবি ও

সাহিত্যিকের নাম করিলাম। শরৎচন্দ্র নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'তবে ও রকম কবি বা সাহিত্যিক হওয়া একটু চেষ্টা সাপেক্ষ। দেখ ত দেখি রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত সুন্দর—

'জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত, আমার অনাহত
তোমার বীণা তারে বাজিছে তারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

বলিতে বলিতে শরৎচন্দ্রের নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, ইহাই কবিতার প্রকৃত উপলব্ধি। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিন্তু একটা মজা দেখতে পাচ্ছেন ত? মাইকেল, হেম, নবীনের মধ্যে কে বড়, কে ছোট—এ নিয়ে বচসা তর্ক-বিতর্ক, এমন কি মারামারি পর্যন্তও হবার উপক্রম হয়ে থাকে জানি, কিন্তু রবিবাবু সম্বন্ধে ওজাতের তুলনা কেউ করতে যায়ও না, বরং এই কথাই বলতে শুনি অনেককে—রবিবাবুর কবিতা বড্ডই শক্ত।'

'শক্ত যে, সে কথা ঠিক। কিন্তু সেই শক্তটুকুকে সহানুভূতির তাপে নরম করতে পারলে যে জিনিষটি দাঁড়ায়, সেটিকে মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়, নচেৎ কবিতা বুঝতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কবিতা জিনিষটি এমন হওয়া চাই, যা পড়তে ভাল—শুনতে ভাল, একবার পড়ে বা শুনে যাতে তৃপ্তি হয় না, যার ভেতরে এমন একটা উচ্চাঙ্গের ভাব রয়েছে, যা সহজ ধারণার অতীত। নইলে 'তুমি মারলে ধাক্কা—আমি মারলাম ঠেলা' একে কি কবিত্ব বলে? এ হচ্ছে

ওই শ্রীমান বাঁশীমোহনের, 'ওহে তাল গাছ! তুমি কেন এত লম্বা, ভীত জগদম্বা'—গোছের কবিতা। ওরে বঙ্গা! তুই এ সম্বন্ধে কি বলিস বলত?'

'কি বলছিস—বল না?'—বলিয়া বঙ্গচন্দ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে শরৎচন্দ্রের পানে তাকাইতেই মৃদুহাস্যের সহিত শরৎবাবু বলিলেন, 'ওরে তোদের বাঁশীমোহনের কবিতার কথা বলছি। তোর কেমন লাগে বলতো?'

'আমাদের বাঁশীমোহন আবার কে?'—বলিতেই শরৎচন্দ্র তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কিঁ বলিলেন, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না।

কিন্তু বঙ্গচন্দ্র অগ্নিশর্মা হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'তুই কি বুঝবি রে মূর্খ এমন কবিত্বের মর্ম! চিরকাল ধরে ত কেবল আমাদের নিন্দে করেই আসছিস। বলি সুখ্যাতির জিনিষকে আদর করতে শিখবি কোন কালে বলত?'

আসন্ন হাসিকে বহু কষ্টে ওষ্ঠ-প্রান্তে চাপিয়া রাখিয়া শরৎচন্দ্র কহিলেন, 'ওরে সুখ্যাতির হলে ত সুখ্যাতি করব, আদর করব। নচেৎ যা-তা জিনিষকে ত আদর করা যায় না।'

শরৎবাবু সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত হইবার বহু পূর্বে দেশে তিনি কি কি বই লিখিয়া হাত মক্সো করিয়াছিলেন, সে কথাটি ঘুণাক্ষরেও তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন নাই। 'বড়দিদি' যে তাঁহার প্রথম বয়সের লেখা সে কথাটা তিনি আমারই কাছে একদিন হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। গল্পটি তখন 'ভারতী'তে তিন সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। আমি দুই সংখ্যা পত্রিকা পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কিন্তু শেষটা আর পড়িতে পারি নাই। শেষে ১৩২০ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে হঠাৎ একখানা ছাপানো বই তিনি আমাকে উপহার দিয়া বসিলেন। উপহার পত্রে লেখা ছিল—'পরম কল্যাণীয় শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ সরকার করকমলেষু। এ ছেলেবেলার হিজিবিজি—কেন

যে প্রকাশ করেছেন তা প্রকাশক বলতে পারেন। এর দোষগুণ তোমার চক্ষে নিশ্চয়ই পড়বে। ইতি—তোমার শরৎদা।'

এই বই যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি যমুনার লেখক। ঐ পত্রিকার সম্পাদক নিজ ব্যয়ে ঐ বই ছাপান। 'ভারতী'তে গল্পটি যখন প্রথম বাহির হয়, তখন উহাতে লেখকের নাম ছিল না। পরে বই পড়িয়া সকলেই তাঁহার গল্পের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল।

আমরা কতকগুলি সভ্য পুরাতন বেঙ্গল সোস্থাল ক্লাব হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করিলাম। ইহাতে আমাদের সাহিত্য-চর্চার পক্ষে বিশেষ সুবিধাই হইল। আমাদের সাহিত্যিক মহলে বন্ধুবর কুমুদনাথ লাহিড়ী ছিলেন একজন প্রকৃতপক্ষে রসজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা সব-কিছুর মধ্যেই কেমন একটা মৌলিকতার ছাপ ছিল। এই সাহিত্য সভায় আমাদের অগ্রজপ্রতিম প্রফুল্লবাবু (কুমুদনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর), বন্ধুবর বিপিনবিহারী দাস, যোগেন্দ্রলাল সেন, প্রেমানন্দ সেন প্রভৃতি গল্প, কবিতা প্রবন্ধ পড়িতেন।

হঠাৎ একদিন শরৎবাবুর আবির্ভাব হইল। অনেক অনুরোধের পর বহুদিন পরে আবার আমরা শরৎবাবুর মুখে শুনিতে পাইলাম :—

("ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ হে।"

গায়কের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।) ক্ষণকাল বিশ্রামের পর, আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, 'ভাখ সরকার! আমি কয়েকখানা বই তোমাদের সাহিত্যসভায় প্রাইজ দেব। যাঁর লেখা সব চাইতে ভাল হবে, তিনিই পাবেন। প্রথমেই দেব রবিবাবুর 'চয়নিকা'।'

দেখিলাম শরৎবাবুর মনটি ভারি খুসি, বোধহয় গানটিও এজন্যই অমন সুন্দর জমিয়াছিল।

এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে রবীন্দ্রনাথের বাছা বাছা কবিতগুলি সুন্দর কাগজে, মলাটে, ছবিতে সাজিয়া গুজিয়া 'চয়নিকা' নামে তখন কেবলমাত্র

বাজারে বাহির হইয়াছে। শরৎবাবু এই চার টাকা মূল্যের দুর্লভ বইখানাই নবপ্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ক্লাব লাইব্রেরীর পক্ষে সুলভ করিয়া দিলেন। কেন না আমাদের মধ্যে এরূপ একটা বোঝাপড়া ছিল, যিনি যে উপায়ে পারেন লাইব্রেরীটিকে পূর্ণ করিবেন। বন্ধুবর কুমুদনাথ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন। লাইব্রেরীর অদৃষ্টে একখানা ভাল কাব্য জুটিয়া গেল। 'চয়নিকা'র পর আরও কয়েকখানা ভাল বই শরৎচন্দ্র ক্লাব লাইব্রেরীতে দান করেন।

আমি শরৎবাবুর ভিতরটার পরিচয় জানিবার জন্য সর্বদাই প্রয়াস পাইতাম। এক দিন রবিবার তাঁহার ছবি আঁকা দেখিতে দেখিতে যে জিনিষটি আমি হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম, সেটি হইতেছে শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন'। একখানা মোটা মলাটের খাতায় মুক্তার পাঁতির ন্যায় সরু সরু সুন্দর অক্ষরে কতকগুলি অধ্যায় লেখা হইয়াছে। সে অধ্যায়গুলির সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের অধ্যায়গুলির মিল নাই। কৌতূহল-বশে পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিলাম। দেখিলাম ৮।৯ অধ্যায় লেখা হইয়াছে। পড়িতে এত সুন্দর লাগিল যে, তা আর বলিতে পারি না। ইহার কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' সবে মাত্র বাহির হইয়াছে। 'গোরা'র পরে এমন সুন্দর লেখা আর পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রথম সাদা পাতাটায় কতকগুলি লেখক-লেখিকার নাম লেখা। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ নাম গুলি কাদের শরৎ দা ?'

উত্তর পাইলাম, 'এরা হচ্ছে আমার সব অন্তরঙ্গ ভক্ত।'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ আর কি, ভাগলপুরে আমাদের একটা ছোটখাট সাহিত্যসভা ছিল, এরা সব তারই সভ্য। এই পুঁটু, এই বুড়ী (নিরুপমা), এই উপীন্ মামা, এই সৌরীন মুখুয্যে, এই সুরেন মামা, এই গিরীন্ মামা।'

ইঁহাদের মধ্যে 'শেফালি' বইখানার দৌলতে সৌরীন মুখুয্যের নামটি জানা

ছিল। ওই বইখানার প্রথম গল্প 'নির্বন্ধ' যেবার 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়, সেবার শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদকতায় বর্দ্ধিতায়তন ভারতীর নব কলেবরের প্রতি সর্বসাধারণেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমরা ঐ গল্পটি পড়িয়া সকলেই একবাক্যে ধন্য ধন্য করিয়াছিলাম। শরৎবাবু প্রশংসার আতিশয্য দেখিয়া আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ হে সরকার! শত মুখে কার লেখার অত তারিফ করছ বলত?'

লেখক এবং পত্রিকা উভয়েরই সংবাদ পাইয়া তিনি কেবল মাত্র অল্প কথায় বলিলেন, 'ভাগলপুরের যারা যারা ছিল, তারা সবাই ভাল লেখে। সৌরীন ও বুড়ী—পদ্যও বেশ লেখে।'

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, শরৎবাবু কবিতা শব্দটিকে কবিতা না বলিয়া পদ্য বলিতেন। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিতাম 'আচ্ছা আপনি কবিতাকে পদ্য বলে অমন খেলো করেন কেন?'

অমনি অম্লান চিত্তে তিনি উত্তর দিয়া বসিতেন, 'ওহে, তোমরা যাকে কবিতা বল, আমি তাকেই পদ্য বলি। কবিতা আর পদ্য দুই-এর মধ্যে যে কোথায় তফাৎ, তা ভাই বুঝতে পারি নে। রবিবাবুই লিখেছেন,—কলকাতায় এসেছি সদ্য, ব'সে ব'সে লিখ্‌ছি পদ্য।—'এখন বল, অত বড় রবিবাবুই যখন পদ্য বলতে পারলেন, তখন আমার বলায় দোষ কোথায়?'

উত্তর করিলাম, 'ও লেখা তাঁর ছেলেবেলার, আর ওর মধ্যে কবিত্ব জিনিষটি তেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠবার দরকারও পড়ে নি। তা যদি পড়ত ত কবি নিশ্চই নিজের অনন্যসাধারণ কলা-কৌশলের বলে রচনাটিকে কবিত্ব-মণ্ডিত করে এর শ্রী সম্পূর্ণরূপে বদলে দিতেন। কিন্তু তা না করে শাদা কথায় সহজ মনের ভাবটি ছড়ার আকারে প্রকাশ করে এর স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষাই করেছেন, তাই হয়ত একে সহজ ভাবেই পদ্য বলেছেন।'

'আচ্ছা, মেনে নিলাম তোমার এ যুক্তি। কিন্তু ছাখ আমি যতক্ষণ না 'কবিতা' 'পদ্য' এ দুটো কথার তফাৎ নিজে বুঝতে পারবো, ততক্ষণ আমি পদ্যই

বলব। এতে যদি তোমাদের কারও কবি-প্রাণে আঘাত লাগে ত আমি নাচার।'

'সে ত বুঝলাম, কিন্তু ইংরেজীতে যাকে ভাস বলে, তাকে সত্যি সত্যিই কি বাংলা ভাষায় পদ্য বলে না? মিল দেওয়া রচনা মাত্রকেই পদ্য বলে, কিন্তু তাকে কবিতা সব সময় বলা চলে না। কেননা কবিতাতে কল্পনা চাই, কবিত্ব চাই।'

'এবার হার স্বীকার করলাম। কিন্তু আমি হলাম নিছক গদ্য মানুষ, আমি শাদা কথায় বুঝি নিছক কল্পনা অনেক সময় বিকৃত মস্তিষ্কেরই পরিচয় দিয়ে থাকে। ওহে সরকার। তোমরা ত কবিতার আলোচনা কর, বল ত সত্যিকার কবিতার জন্ম কোথায়? যেখানে সকল রকম অনুভূতির উৎস উৎসারিত হচ্ছে, সেই জায়গাটি নয় কি? হালকাভাবে যা তা লিখলে, বা একটা উদ্ভট কিছু কল্পনা করলেই কবিতার সাধন হল না। মর্ম দিয়ে সত্যের স্বরূপটি উপলব্ধি করা চাই সকলের আগে। তারপর তার প্রকাশ, নিজের হৃদয়ে যতটা সহানুভূতি আছে, তাই দিয়ে—তাহলে তোমার পদ্যই বল, আর তোমার গদ্যই বল, কিছুই ফেলা যাবে না। দেখ ত দেখি কি সুন্দর কবিত্ব এই সামান্য এক পংক্তিতে, যা কেবল একমাত্র বৈষ্ণব মহাজনদের মুখেই শোভা পেত। 'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' এই ছোট কথা ক'টির মধ্যে অর্থের ব্যপকতা একবার লক্ষ্য করেছ ত? মনে হয় এ নিয়ে একখানা বই লেখা চলে। আবার দেখ কি সুন্দর—

'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।'

কানে আমরা কত শুনি, কিন্তু সেগুলি আমাদের প্রাণে বসে না। এখানে মরমে প্রবেশ করানো চাই,—যেখানে প্রবেশ না করলে, শোনা না-শোনায় কোন ভেদ থাকে না। এ সব অনুভূতির বিষয় ভায়া, অনুভূতির বিষয়। সহজ

কথায় সত্যটি এখানে কেমন সুন্দর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে! তাই বলতে চাই কি, সহজ সুন্দর করে যা বলব, তাই হবে জগতে আদরের বস্তু। স্পেন্সার আমার অত ভাল লাগে কেন, যদি শুনতে চাও ত বলি, স্পেন্সার-এর সহজ সরল উক্তির জন্যে, সেটার মূলে সত্যের সহজ উপলব্ধি।'—বলিতে বলিতে শরৎবাবু চুপ করিয়া গেলেন। আমিও এই অবসরে তাঁহার 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপির মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেলাম।

কেমন করিয়া মানুষ আত্মানুশীলন দ্বারা সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা গিয়াছে শরৎচন্দ্রের জীবনে। যে লোকটিকে আপাত দৃষ্টিতে নিতান্তই খামখেয়ালী বই আর কিছুই মনে হইত না, সেই লোকটিরই যে সাহিত্য-সাধনা লোক চক্ষুর অন্তরালে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে আশ্চর্য কৌশলে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিল, সত্য সত্যই তাহা প্রণিধান করিবার বিষয়।

চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিখানা আবিষ্কারের পর হইতে আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইল, যে যতই যা মনে করি না কেন, এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসখানি রচনা হিসাবে যে একখানি চমৎকার গ্রন্থ, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেমনি পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা তেমনি সুন্দরভাবে সাজানো আখ্যানগুলি। পড়িবামাত্রই প্রত্যেকটি দৃশ্য চোখের সামনে উজ্জ্বল রঙে ফুটিয়া ওঠে।

'শরৎদা। আপনি এমন সুন্দর লিখতে পারেন অথচ লেখেন না কেন?'

শরৎবাবু উত্তর করিলেন—'কই আর পারি তেমন লিখতে।'

'কেন এই যে মেলাই লিখেছেন।'

'আরে সরকার, তুমিও যেমন—বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখা, ও চেষ্টা করলে অনেকেই পারে'—বলিয়াই, মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতে লাগিলেন। কথাটার মধ্যে যে একটুখানি ইঙ্গিত ছিল, এবং ইঙ্গিতটা কাহার প্রতি তাহাই বলিতেছি।

ঐ সময় খ্যাতনামা লেখক প্রভাতবাবু বাদে আরও দুই একজন লেখক কথা-সাহিত্যে বেশ একটু খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। আমি যে লেখকটির কথা একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে শরৎবাবুর কাছে উল্লেখ করিয়াছিলাম, তিনি তখন 'ভারতী'র লেখক। অবশ্য স্বদেশী যুগের প্রথম আমলের উক্ত লেখকেরই জোরালো ভাষার গুটিকয়েক কবিতা প্রথম প্রথম পড়িয়া আমাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে এই নব্য লেখকের ভিতর এমন একটা শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে যাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত রূপে সাধনা করিলে বাংলা সাহিত্যে লেখকের একটি স্থান স্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে। ইঁহারই দুই তিনটি গল্প 'ভারতী'তে পড়িয়া আমরা কয়েকটি বন্ধু যারপর-নাই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। পরে যখন তাঁহার গল্পের বই বাজারে বাহির হইল, তখন একদিন কথায় কথায় শরৎবাবুকে বলিলাম, 'শরৎদা, একখানা সুন্দর গল্পের বই বেরিয়েছে, পড়তে এত ভাল যে চোখের জল রাখা যায় না।'

লেখকের নাম শুনিয়া তিনি জবাব করিলেন 'ওঃ! অমুক ত! ও বেশ লেখে।—কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমাকেই গুরু বলে পরিচয় দেয়।'

আমিও প্রত্যুত্তর করিলাম, 'তা বটে! কিন্তু দেখছি শিষ্যবিদ্যা গরিয়সী।'

একটুখানি হাসিয়া শরৎবাবু জবাব করিলেন, 'ওহে আমিও নেহাৎ মন্দ লিখি নে। লিখলে অনেকের চেয়েই বোধ হয় ভাল লিখতে পারি।'

সে সময় যে শরৎচন্দ্র চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে নিভৃতে সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা জানিতাম না। এইবারে 'চরিত্রহীন'-এর অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পড়িয়া তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিল। মনে হইল, এ আগুন বেশীদিন চাপা থাকিবে না, একটুখানি সহানুভূতির অনুকূল বাতাস লাগিলেই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। আমি শরৎবাবুকে ক্রমাগত অনুরোধ করিতে লাগিলাম, আমাদের ক্লাবের সাহিত্যসভায় একটা প্রবন্ধ বা রচনা পড়িবার জন্য। শরৎবাবু সে সব অনুরোধে আদৌ কর্ণপাত করিলেন না,—আমাকে পুনঃ পুনঃ নিরস্ত করিতে লাগিলেন নানারূপ ছলতর্ক

ধরিয়া। শেষে দেখিলেন, যে আমার হাত এড়ানো তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য, তখন বাধ্য হইয়া কথা দিলেন, 'আচ্ছা যখন সভাসমিতিতে পড়বার মত মনে হবে, তখন পড়া যাবে।'

ইহার পর হইতে তিনি আমাদের সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সাহিত্যসভায় মাঝে মাঝে যোগদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দেখা গেল সাহিত্যসভার দিকে তাঁহার একটু একটু করিয়া ঝোঁক চাপিতেছে। কিন্তু প্রবন্ধ পড়িবার জন্য যতই অনুরোধ করি না কেন, কিছুতেই তাঁহাকে রাজি করানো গেল না। কেবল ওই একই উত্তর—আচ্ছা পড়বার মতন হলে পড়া যাবে। আমরা ত অগত্যা নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলাম। তবে মাঝে মাঝে সাহিত্যসভায় যোগদান করিয়া গান গাহিয়া, গল্প গুজব করিয়া, আমাদিগকে যে ভাবে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, আপাততঃ তাহাতেই আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিলাম।

এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। হঠাৎ একদিন কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে অবশেষে ঠাট্টা সহ্য করিতে না পারিয়া শরৎবাবু আমাদিগকে কথা দিলেন যে তিনি 'নারীর ইতিহাস' নামে একটি প্রবন্ধ আমাদের সভায় পড়িবেন। প্রবন্ধ লেখা সমাধা হইলে তিনি যথাসময়ে আমাকে দিয়া সাহিত্য-সভার সম্পাদককে সংবাদ জানাইলেন।

পক্ষকাল অপেক্ষার পর দীর্ঘ প্রবন্ধ ত লেখা শেষ হইল, কিন্তু লেখক কিছুতেই দশজনের সুমুখে দাঁড়াইয়া উঁচুগলায় প্রবন্ধ পড়িতে রাজী হইলেন না। যতই তাঁহাকে অনুরোধ করা যায় ততই তিনি আরও বাঁকিয়া বসেন, কেবলই অজুহাত যে তিনি কিছুতেই গলার স্বর চড়াইয়া নামাইয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রবন্ধ পড়িতে পারিবেন না। ওর চেয়ে বরং আর কেহ পড়িবে। এ দায়ও আমার ঘাড়েই চাপিল। বিশ্রী বর্ষায় একদিন সকাল বেলা দেড় মাইল পথ জলকাদা ঠেলিয়া তাহার গৃহাভিমুখে যাত্রা করা গেল। গিয়া দেখি মহাপুরুষ বাড়ীতে নাই। ডাকাডাকির পর একটি লোক বাহিরে আসিয়া সাড়া দিল।

তাহার কাছে অবস্থা জানাইতেই সে ঘরে ঢুকিয়া একটা প্রকাণ্ড কান ফোঁড়ানো কাগজের নথি আনিয়া আমার হাতে দিয়া গেল। প্রবন্ধের চেহারা দেখিয়াই আমার পেটের পিলে জল হইয়া গেল। সর্বনাশ! এই পিঁপড়ের সারির মতন ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ভর্তি মহাভারত কে পড়িবে? আমার শক্তিতে কুলাইবে না, যদি আর কেউ সাহসী হন ত চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

কেউই রাজী হইলেন না, অগত্যা আমাকেই সেই ছোটখাট মহাভারত পড়িবার ভার গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু অসুবিধার বিষয় হইল, যে সেই দিনেই অপরাহ্নে সভা, একটিবার যে প্রবন্ধটার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া যাইব সে অবসরও আমার রহিল না। ঐ অবস্থায়ই ঝুড়ি ঝুড়ি কোটেসন ভরা মহাভারত আমাকে দুই ঘণ্টায় শেষ করিতে হইল।

যতদূর মনে পড়ে প্রায় এইরূপ সময়েই নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' উপন্যাসখানা 'ভারতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। শরৎবাবুকে কথাটা বলিতেই তিনি জবাব করিলেন, 'বুড়ী ভালই লেখে হে সরকার। ওর পদ্য ত পড় নি, পড়লে মুগ্ধ হয়ে যাবে। বুড়ীর দাদা পুঁটু (বিভূতি ভট্ট) একজন দার্শনিক। এরা দু ভাইবোন বাদে আর যারা আমাকে লেখক বলে খাতির করে থাকে, তারা হচ্ছে আমার উপীন মামা, সুরেন ও গিরীন মামা, এবং সৌরীন। আমার বড়ই আহ্লাদ হচ্ছে, যে আমার এই সব অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের লেখা কল্‌কাতার বড় বড় পত্রিকায় বেরুচ্ছে।'

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া বসিলাম, 'আচ্ছা শরৎদা! এঁদের লেখা বেরুচ্ছে বুঝলাম, কিন্তু আপনি এঁদের সাহিত্য-গুরু হয়ে এমন নিশ্চেষ্ট আছেন কেন বলুন ত?'

শরৎবাবু যে উত্তর করিলেন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট আত্মমর্যাদার পরিচয় পাওয়া গেল। বলিলেন, 'দেখ হে, যদি আমার লেখা সত্যি সত্যিই ভাল

হয় ত, কাগজের সম্পাদকেরা আগ্রহ করে নিতে চাইবে। নচেৎ লেখা ছাপানো সম্বন্ধে আমি চিরদিনই নিশ্চেষ্ট থাকব।'

'আপনি তাদের লেখা না দিলে, তারা জানবেই বা কেমন করে যে আপনি একজন লেখক, আর বুঝবেই বা কেমন করে যে বাস্তবিকই আপনার লেখা সুন্দর!'

'তা—কি করব ভাই! নিরুপায়। সচক্ষে না দেখেছি—এমন ত নয়? নূতন লেখকগুলো যে রকম করে লেখা ছাপাবার জন্যে ধন্না দিয়ে পড়ে, তা দেখলে সত্যি সত্যিই লেখক বেচারাদের ওপর দয়া হয়। অনেক খোসামোদ অনুরোধ উপরোধের পর যদিই বা কস্মিনকালে কারো এক আধটা পদ্য বা গল্প কোনো কাগজে বের হল ত সম্পাদক বেচারার আর রক্ষা নেই, অমনি ওই লেখকের ঝুড়ি ঝুড়ি লেখা এসে তাঁর দপ্তরে জমা হতে থাকে। লেখকেরও একটু সাহস বেড়ে যায়। যদি সে স্থানীয় লোক হয় ত কথাই নেই, পথে ঘাটেও সম্পাদককে তাড়া করতে কসুর করে না। যদি দেখে বেগতিক, অমনি কোন গতিকে লেখাগুলি ফিরিয়ে এনে অন্য কোন সস্তার রদ্দি কাগজে ছাপানোর চেষ্টা দেখে। শেষে ছাপা হলে এমনি করে সে কাগজে আগের সম্পাদকের নামে খেউড় গাইতে সুরু করে দেয়, যা কোন মতেই সমর্থন করা চলে না। এইত ভায়া তোমাদের সাহিত্য-মহলের ব্যাপার। তোমার শরৎদা এই সব আবহাওয়ার বাইরে থেকে ভালই করেছে। দেখ হে তোমরা ত সব পদ্য বললে হয়ত চটে যাবে,—এত যে সব কবিতা লেখ, বলতে পার, ক'জন সত্যিকার প্রাণ ঢেলে দিয়ে কবিতা লিখে থাকে। সত্যিকার প্রাণ থাকলে অত সব উদ্ভট কল্পনার জন্য মাথা খেলাতে হয় না। দেখ কবিতা-টবিতা এককালে লেখার বাই আমারও ছিল। আমি গাথা লিখতে জানতাম! কিন্তু সে সব যে কোথায়, সে কথা ত আজ মনেও পড়ে না সরকার! অথচ কবে সুরেন মামাদের কথামত 'মন্দির' নামে গল্প লিখে যে পুরস্কার পেয়েছিলাম, সে কথা ত আমার বেশ মনে আছে। আসল কথা হচ্ছে ভাই—সংসারে, সত্যকার

প্রাণের জিনিষটিই টিঁকে থাকবে কৃত্রিমটা কখনো থাকবে না। শেকস্‌পীয়রের যুগে বিলাতে ত কম সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় নি, কিন্তু বলতো ক'জনের নাম করতে পারা যায়? অতদূরে বিদেশে যাবারই বা কি দরকার? আমাদের বঙ্কিমবাবুর যুগেই ধর না কেন! বঙ্কিমবাবুর দেখাদেখি কতজনই যে সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন তা আর কতক কতক না জানো এমন নয়। কিন্তু যাঁরা নিজেদের প্রাণের টানে না এসে বঙ্কিমের নকল করে হুবহু বঙ্কিম হতে চেষ্টা করেছিলেন, বলতে চাও কি তাঁরা এখনও টিঁকে আছেন? যদি ওঁরা কেউ কেউ থেকে থাকেন ত সে বইয়ের দোকানে। সাহিত্যের রাজ্যে নয়। তাঁরা দু'চার বছরে গেলেন বলে। আজকালকার দিনে রবিবাবুর কথাই ধর না কেন? গদ্যে পদ্যে কতজন যে হুবহু তাঁর নকল করে চলেছে, তার কি একটা লেখাজোখা আছে? থাকলে রবিবাবুই থেকে যাবেন। রবিবাবুর কেমন প্রাণটেনে লেখা! দেখত দেখি কেমন সহজ অথচ সুন্দর সত্য তাঁর কবিতায় ফুটেছে—

এ সাত মহল ভবনে আমার
চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
দূরে এসে চাই ঘর বাঁধিবারে
আপন বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মেটাতে?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চিরজনমের ভিটাতে?

এমন কবিতা রবিবাবুর আরো কত আছে! কবিতার মূলে কল্পনা থাকলেই যে সেটা একটা উদ্ভট কিছু হবে, তা নয়। (মূলে হল সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি,

তারই ওপরে যত কিছু সাহিত্য সাধনা, তা পদ্যই বল আর গদ্যই বল। অনুশীলন আর মর্মের সহযোগ ব্যতীত কোন সাধনায়ই সুফল লাভ করা যায় না ভাই।'—বলিয়াই শরৎবাবু তাঁহার মন্তব্য শেষ করিলেন।

শরৎচন্দ্র যেরূপ শক্তির অধিকারী ছিলেন,—সেইরূপ সংযমীও ছিলেন। তিনি যে অসামান্য মনীষার বা বিদ্যার অধিকারী ছিলেন এমন কথাও বলিতেছি না। বলিতেছি, তাঁহার ভিতরে কি পরিমাণে উদ্ভাবনীশক্তি নিহিত ছিল এবং এই শক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি কেমন যেন নিশ্চেষ্ট হইয়াই জীবনের একটা দীর্ঘ সময় নষ্ট করিতেছিলেন। যদি না তিনি সামান্য একমাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় গিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদের বিশেষতঃ 'যমুনার' ফণীবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে উক্ত পত্রিকায় লিখিতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেন, তাহা হইলে কয়জনে বা পাইত, 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে'র পরিচয়, কয়জনে বা জানিত তিনি একজন এতবড় লেখক!

শরৎবাবু যখন কলিকাতা হইতে ফিরিলেন, তখন ৭।৮ খানা উপহার প্রাপ্ত বাংলা গল্পের বই আনিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, বেঙ্গল ক্লাব লাইব্রেরীতে দিতে। এই বইগুলির বেশীর ভাগই সৌরীন্দ্রমোহন মুখুজ্যের।

শরৎবাবু আসিয়াই 'রামের সুমতি' গল্প লেখায় জোর দিলেন। রোজ যতটুকু করিয়া লেখেন অফিসে আসিয়া আমাকে দেখান, আমি অফিসের সকল কাজ কর্ম ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার গল্প পড়ি। এইরূপ করিয়া ৮।১০ দিনে যখন উক্ত গল্পের অর্ধেকখানি লেখা হইল, তখন প্রথম সংখ্যার উপযুক্ত মনে করিয়া তিনি 'যমুনা' সম্পাদককে ঐ লেখাটুকুই পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্ট-খানি আগামী মাসে পাঠাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঐ সময় 'ভারতী'তে রবিবাবুর 'পণরক্ষা', 'রাসমণির ছেলে' প্রভৃতি গল্প বাহির হইতেছিল।

জানি না কি কারণে ঐ 'রামের সুমতি'র আধখানাই আমার কাছে এত

ভাল লাগিল যে, সে কথাটা কাহারও কাছে না বলিয়া পারিলাম না। অনেকেই যে, আমার কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। কেবল একমাত্র পোষ্টাফিসের বিভূতিবাবু আমার কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'যোগীনদা, কথাটা যা বলেছ, ঠিকই। শরৎদার ভিতরে যে একটা কিছু আছে, এ সন্দেহ অনেকদিন থেকেই আমার মনে লেগেছে। এখন মনে হচ্ছে তুমি যা বলেছ তা ঠিক। বাস্তবিক লোকটি যে একটু অসাধারণ রকমের তা ত তাঁর ছবি আঁকায় টের না পেয়েছ এমন নয়।'

শরৎবাবুর অসমাপ্ত 'রামের সুমতি'র আমি অযথা প্রশংসা করিয়াছিলাম এমন নয়। কেন না উক্ত প্রশংসার দ্বারা যাঁহাদের কাছে আমি প্রথমটায় হাস্যাস্পদ হইয়াছিলাম, গল্পটির অর্ধেকটা যমুনায় প্রকাশিত হইতেই তাঁহারা ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন, 'বাস্তবিকই আপনি ভাল জিনিষকেই প্রশংসা করেছেন। কিন্তু 'সাহিত্য' পত্রিকায় যে 'হরিচরণ' ও 'বাল্য-স্মৃতি' বলে দুটি গল্প বেরিয়েছে, সে দুটি কিন্তু আমাদের মোটেই ভাল লাগে নি।'

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, 'তা হলে দেখুন প্রশংসার জিনিষকেই প্রশংসা করেছি।'

শরৎবাবু 'সাহিত্যে' তাঁহার ছেলেবেলাকার গল্প দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'দেখছ ভায়া ব্যাপারখানা। 'সাহিত্যে'র মতন পত্রিকায় আমার কোন্ ছেলেবেলাকার লেখা গল্প ছাপিয়েছে। কে যে এই লেখা গল্প ছাপিয়েছে, কে যে এই লেখাগুলো আমাকে না জানিয়ে ছাপাতে দিলে, তাও ত জানবার উপায় নেই। আমার আগেকার আরও কতকগুলি লেখা আছে, যেমন 'চন্দ্রনাথ', 'কাশীনাথ', 'দেবদাস'। এগুলোর মধ্যে 'চন্দ্রনাথ'খানাই আমার নিজের কাছে সব চাইতে ভাল লাগে। এবার ছুটির মধ্যে সৌরীন লেখাটা আমাকে পড়ে শোনাচ্ছিল। তা মন্দ লাগল না হে। এ গুলো বাদে আমার হেনরি উডের 'ইস্টলীন'-এর একখানা অনুবাদও আছে, সে খানার নাম 'অভিমান'। এই ইস্টলীন বইখানা আমার কাছে খুবই ভাল লাগে।'

তাহার পর নিজের 'রামের সুমতি' লেখার প্রসঙ্গে বলিলেন, 'ভাখ হে বানিয়ে বানিয়ে কত লেখা যায় বলত? এর চেয়ে ত দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়তে আমার বেশ ভাল লাগে। আরও দেখবে একটা মজা, যারা বড় বড় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তাদের লেখাও কত সুন্দর। এই জন্যেই আমি স্পেন্সার, হাক্‌স্‌লী, ডারউইন, টিন্‌ড্যালের লেখা অত ভালবাসি, এঁদের লেখা কেমন পরিষ্কার এবং স্পষ্ট। কোথাও একটি বাজে কথা খুঁজে পাবার জো নেই। লেখার আগাগোড়ায় একটা যদি সামঞ্জস্য না থাকে ত সে রকম লেখা মিছে।'

শরৎবাবুর কথাবার্তায় বুঝিতে পারিলাম, তিনি যে এত পরিশ্রম করিয়া লেখেন, ইহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, রচনাটিকে বাজে কথার আবর্জনা হইতে মুক্ত রাখিয়া সুন্দর সুস্পষ্ট করিয়া তোলা।

শরৎবাবুর আধখানি গল্প পাইয়াই ফণী পাল মহাশয় আনন্দে গদগদ হইয়া শরৎবাবুকে যে চিঠি লিখলেন, বাস্তবিকই তাহার মধ্যে একটা প্রাণের টান ছিল। তখনকার দিনে ক্ষুদ্রকায়া 'যমুনা' দু'চার মাসের মধ্যেই সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহার মূলে যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার সহযোগ ছিল—একথাটা সকলেই জানেন।

শরৎবাবু আমাদের এবং ফণীবাবুর উৎসাহে যখন দ্বিতীয় মাসে 'রামের সুমতি' গল্পটি যে ভাবে খাড়া করিয়া 'যমুনা'য় প্রকাশ করিলেন—তাহাতে সত্যসত্য পাঠক মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। যাঁহারা পূর্বে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন, দেখা গেল তাঁহাদের অনেকেরই মত পরিবর্তিত হইয়াছে। অচিরেই তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লেখকেরও কর্ণে গিয়া প্রবেশ করিল। তিনি ইহাতে একটুখানি হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অন্তরের বিপুল আনন্দ কোন বাধা বন্ধনই মানিল

না—ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া ও দুইটি চোখের কোণ ছাপাইয়া উছলিয়া উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

আমাদের অফিসের অনতিদূরে একটি চায়ের দোকান আছে। সেই দোকানটিতে শরৎবাবু ও আমি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুইটা বাজিলে চা খাইতে যাইতাম। টিফিনের ছুটি মাত্র অর্ধঘণ্টা। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের অফিসের উপরওয়ালারা কোন কালেই তেমন কড়া ছিলেন না বলিয়া আমরাও অনায়াসে এই সনাতন নীতিটি লঙ্ঘন করিয়া চলিতাম। তখন শরৎবাবু খুব জোরসে গল্প লিখিতেছেন। রামের দুর্মতি ঘুচিয়া গিয়া যখন এক মুহূর্তে সে সুমতি ফিরিয়া পাইল, তখন আমাদেরও অনেকেরই এমন মনে হইয়াছিল, এ সুমতিটা বোধ হয় রামের সঙ্গে সঙ্গে শরৎবাবুও ফিরিয়া পাইলেন।

এই চায়ের দোকানে বসিত আমাদের উভয়ের সাহিত্যের বৈঠক। শরৎবাবু শুকদেব ঋষির মতন সদুপদেশপূর্ণ অনেক কথাই বলিয়া যাইতেন, আর আমি কেবল কান পাতিয়া তাহা শুনিয়া যাইতাম।

শরৎবাবু একদিন কথায় কথায় বলিলেন, 'দ্যাখ ভায়া লিখি ত কেবল তোমার উৎসাহে আর 'যমুনা' সম্পাদকের তাগিদে। জানি না পাঁচজনের কাছে কেমন লাগছে।'

প্রত্যুত্তরে বলিলাম, 'বোধ হয় ভালই লাগছে। নইলে আমরাই বা অযথা উৎসাহ দেব কেন? আর সম্পাদকেরই বা এত তাগিদ দেবার গরজ পড়বে কেন, বলুন তো?'

'হ্যাঁ তাও বটে'—বলিয়াই শরৎবাবু চুপ করিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ রেঙ্গুনের পাঠক সমাজ যখন 'রামের সুমতি'র প্রশংসায় মুখর হইয়া হইয়া উঠিল, তখন শরৎবাবুরও লিখিবার উৎসাহ অনেকটা বাড়িয়া গেল। 'রামের সুমতি' সমাধা হইতেই আবার বাংলাদেশ হইতে তাগিদ আসিল। কেননা এই গল্পটিতে বাংলার পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়াছিল।

তখন লেখা সুরু হইল 'পথ নির্দ্দেশ'। এটিও পূর্বটির মতনই লেখা হইতে লাগিল। যতটুকু প্রতিদিন লেখা হয়, ততটুকুই অফিসে আনিয়া আমাকে পড়িতে দেওয়া হয়। বেশীরভাগ পড়া, এবং আলোচনা হয় এই চায়ের দোকানে। কোন কোন দিন টিফিনের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া এতই বিলম্ব হইত যে অফিসে ঢুকিতে লজ্জা করিত। আমাদের সিংহলবাসী পক্ককেশ বৃদ্ধ সুপারিণ্টেনডেণ্ট সাহেব একটুখানি হাসিয়া বলিয়া উঠিতেন, "ও আই সি বোথ অফ ইউ হ্যাভ রিটার্ণড য়্যাট লেট!"

এই মন্তব্যের আঘাতে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতাম। ইহার পরের দুই তিন দিন হয়ত টিফিন সমাধা করিয়াই ভাল মানুষের মত যথাসময়ে ফিরিয়া আসিতাম।

'পথ নির্দ্দেশ' গল্পটি শরৎবাবুর নিজের কাছে 'রামের সুমতি' হইতে ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু গল্পটির উপসংহার আমাদের কাছে ভাল লাগিল না। কতরকম অনুযোগ-আব্দার করিয়া লেখককে দিয়া পুনরায় উহার শেষাংশ লেখান গেল না। (রাধাকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমের উল্লেখ করিয়া বলিলাম, 'শরৎদা! মুখে বলেন, আপনারা বৈষ্ণব। ভাবুন দেখি একবার সেই বৃন্দাবনের চির কিশোর-কিশোরীর প্রেমলীলার কথা যার সঙ্গে কোনরূপ ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক ছিল না। আপনার যেমন লিখবার ক্ষমতা, এতে মনে হয়, আপনি অতি সুন্দর করে সেই ভাবটি এতে ফোটাতে পারবেন।')

প্রথমেই প্রতিবাদের সুরে শরৎবাবু বলিলেন, 'তোমরা যেমন রুচিবাগীশ, এতে আর গল্প নভেল লেখা চলে না। সব তোমাদের ধর্মে লাগে, মর্মে লাগে, কর্মে লাগে।'

'তা লাগুক, শরৎদা আপনি লেখক, আমরা পাঠক ; আমাদেরও ভাললাগা চাই ত ?'

কথাটায় শরৎবাবু তেমন খুসী হইলেন না। গম্ভীরভাবে জবাব করিলেন, 'হ্যাঁ তা বটে।'

মনে মনে একটা নিদারুণ হাসি পাইল, সেটাকে বহু কষ্টে চাপিয়া ফেলিলাম।

শরৎবাবু পূর্ববৎ গম্ভীর মুখে কহিলেন, 'দ্যাখ, লেখকের নিজেরও ত একটা বিচার করবার ক্ষমতা আছে, না সেটাও নাই ? নানাজনে অনেক রকম উল্টোপাল্টা কথা তোমরা বলতে চাও। পাঁচজনের মুখ-চেয়ে মতামত নিয়ে কাজ করতে গেলে, আর চলে না সংসার।'

কথাটায় একটুখানি উষ্ণ যে না হইলাম, এমন কথা বলিতে পারি না। বিলক্ষণই উষ্ণ হইলাম অথচ একটা লাগসই জবাব না দিতে পারিলেও মনের ক্ষোভ মিটিতেছে না, তদ্দণ্ডেই বলিয়া ফেলিলাম, 'সে কথা সত্যি শরৎদা। এ কথাটা আরও সত্যি, যে পরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেই, সে তার নিজের পছন্দসই একটা জবাব দেবেই—যদি সে নেহাৎ খোসামুদে না হয়।'

বুঝিলাম আমার কথাটার আঘাতটুকু তাঁহাকে বেশই লাগিয়াছে। বিলক্ষণ দুঃখের ভরেই সামান্য জবাব দিলেন। তেমনি গম্ভীর ভাবেই কহিলেন, 'তা হলে বল, কি করলে তোমরা খুসী হও ?'

পাল্টা জবাব দিলাম, 'যা বলবার তা ত বলেছিই শরৎদা। এখন আপনার যা খুসী, আমার বলবার কিছু নেই—'

'আচ্ছা দেখা যাক্ পারি কি না'—বলিয়াই সকল রকম বাদ-প্রতিবাদের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

কিন্তু এরূপ গাম্ভীর্য আমার পছন্দ হইল না। মনে হইল, নিশ্চয়ই শরৎদা আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যদিই ধারণাটা সত্য হয়, এটা যে কত বড় মর্মান্তিক কথা, তাহা ত কল্পনায় আনা যায় না।—থাক্ কাজ নাই আমার

বাক্‌বিতণ্ডায়। উহাতে হয়ত উঁহার স্নেহ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইব। কাজ কি অমন একটা দুর্ঘটনাকে জীবনে অযথা টানিয়া আনিয়া?

তখন শরৎবাবুর কাছে গিয়া বলিলাম, 'শরৎদা! আপনার এমন গল্পটার শেষাংশটুকু আমার কাছে কেমন যেন হালকা মনে হচ্ছিল, তাই কথাটা বলেছিলাম। এতে যদি সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে বলে মনে করেন ত কথাটা আমি প্রত্যাহার করছি। আপনার বিচার বুদ্ধিতে যেরূপ ভাল বুঝবেন, সেইরূপই করুন না কেন?'

শরৎবাবু আমাকে বোধহয় একটু খুশী করিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন, 'না হে সরকার, তোমার কিছু অন্যায় হয় নি। কথাটা ভেবে দেখলাম মন্দ বল নি। আচ্ছা দেখা যাক্ কি করতে পারি।'

'নিশ্চয় পারবেন—শরৎদা, নিশ্চয় পারবেন।'

'না পারলে কিন্তু আমার অপরাধ নেই ভায়া'—বলিয়া শরৎবাবু মনের কোণে একটুখানি ক্ষোভ রাখিয়া গেলেন। আমারও জবাব দিতে আটকাইল না! তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলাম, 'আচ্ছা, সেই কথাই সত্যি। অপরাধ যা তা আমার, শরৎদা।'

(যেদিন সম্পূর্ণ গল্পটি পুনরায় পড়িবার অবকাশ পাইলাম, সেদিন মনে হইল, ঐন্দ্রজালিকের কাঠির স্পর্শে শেষ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া আগাগোড়া গল্পটিকে এমন শ্রী-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে, যাহা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—অনুপম। বাস্তবিকই দুইটি নরনারীর চরিত্র লইয়া এরূপ যাদুকরের মতন ভোজবাজী দেখানো বড় সহজ কৃতিত্বের কথা নয়। কোনরূপ গুরুতর সম্পর্কের বন্ধন উভয়ের মধ্যে নাই,—যাহা আছে, সেটি দুজনের উদ্দাম যৌবনের মুখে ফুৎকারের মত ছিঁড়িয়া যাইতে কতক্ষণ? পাঠক হয়ত একটা আশ্চর্য রকমের রোমান্স কল্পনা করিতে করিতে আখ্যায়িকার সঙ্গে সঙ্গে উধাও হইয়া দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিতেছিলেন; কিন্তু যখন উপসংহারে ভাগনীগুলির মুখে হেমনলিনী নিজের সম্পর্কে ভগিনী সম্পর্ক শুনিলেন,

জানি না তখন তাঁহার মনের অবস্থা কোথা হইতে কিরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিশ্চয়ই তাঁহার ব্যাহত কল্পনা সেদিন তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের কাছে এই উপসংহার ভাল লাগিয়াছিল। কেন, সে কথার উত্তর নাই।

গল্পটি যমুনায় বাহির হইতেই, সৌরীন মুখুয্যে মহাশয় লেখককে এক চিঠিতে অজস্র প্রশংসা করিয়া ছোটখাট সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলেন। শরৎবাবু আমাকে চিঠিখানা পড়িতে দিয়া বলিলেন, 'ছাখ হে! সৌরীনও গল্পটিকে ভালই বলেছে।'—বলিয়াই একটুখানি গাম্ভীর্যের ভাণ করিলেন। কিন্তু সেটা বৃথা চেষ্টা মাত্র। অন্তরের স্বভাবসুলভ আনন্দটুকু চোখে মুখে যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

দৃশ্যটি লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, 'দেখলেন ত? যা বলেছিলাম ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ হে সরকার, তুমি ঠিকই বলেছিলে। সত্যিই ত সব সময় নিজের বিচার নির্দোষ হয় না।'

'তবেই বুঝতে পাচ্ছেন, আমরাও ভাল-মন্দটা ধরতে পারি।'

'তা কি আর অস্বীকার করছি? বাস্তবিকই তোমার কথামত শেষটুকু বদলে দিয়ে ভালই করা গেছে। এ প্রশংসার অর্ধেক ভাগ তোমার প্রাপ্য।'

'ওতে আর দরকার নেই শরৎদা। স্নেহ করেন বলে যে আপনার লেখা আমাকে পড়তে দেন, এইটেই সব চেয়ে সুখের বিষয়। জানেন না বোধহয়, ছাপার বইয়ের চাইতে হাতে লেখা বই-পড়ার দিকে আমার ঝোঁক বেশী। কেন না সেইটেই হল আসল—ছাপাটি নকল। আসল ফেলে নকলের দিকে ঝোঁক দিতে যাব কেন। সত্যিই যদি আসলটাকে পাই।'

'তার জন্যে আর ভাবনা কি ভায়া। পড়বার ধৈর্য থাকবে ত?'

উত্তর করিলাম, 'আপনার লিখবার ধৈর্যচ্যুতি না হয় ত আমারই বা পড়বার ধৈর্য থাকবে না কেন বলুন ত? খুব ধৈর্য থাকবে দেখবেন।'

'বেশ এই কথাই রইল। যখন যা লিখি, তা তোমাকেই কেবল পড়তে দেব।'

'তথাস্তু'—বলিযাই আমিও নীরব হইলাম।

'সাহিত্য'-এর সমাজপতি মহাশয় ছিলেন সাহিত্যের বাজারে একজন পাকা জহুরী। সেখানে কোনটা মেকি, সেটা যেমন তিনি চট করিয়া ধরিতে পারিতেন, এরূপ খুব কম ব্যক্তিই পারিতেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সাহিত্যের কারবারেও সাচ্চা বই ঝুটা চলিবার জো ছিল না। এরূপ অবস্থায় অনেক উদীয়মান লেখককেই সমাজপতি মহাশয়ের মুখ চাহিয়া তখনকার দিনে লেখনী পরিচালনা করিতে হইত। এই সমাজপতি মহাশয় যে কি উপায়ে শরৎবাবুর গুপ্তভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া 'হরিচরণ', 'বাল্যস্মৃতি' এবং 'কাশীনাথ'কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে খবর স্বয়ং লেখকও জানিতেন না। কেন না গল্পগুলির লেখক তিনি হইলেও, সেগুলির খোঁজ তিনি কস্মিনকালেই রাখিতেন না। যাঁহারা রাখিতেন তাঁহারা তাঁর ভাগলপুরের বন্ধুবর্গ। তাঁহাদেরই কে একজন লেখকের বিনানুমতিতে গল্পগুলি সাহিত্যে দিয়াছিলেন।

সমাজপতির দূরদর্শিতাও ছিল যথেষ্ট। যখন দেখিতে পাইলেন, যে, 'যমুনা'র মতন একখানা পত্রিকা শরৎবাবুর নূতন গল্পগুলির জোরেই অত শীঘ্র পাঠক মহলে আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন শরৎবাবুকে হাতে চাই-ই চাই। এই উদ্দেশ্যে তিনি যেরূপ বিনয়পূর্ণ এক চিঠি শরৎবাবুকে লিখিলেন, তাহাতে সত্যসত্যই অবাক হইয়া যাইতে হয়। অত বড় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সমাজপতি শরৎচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। শরৎবাবু তখন গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিখ্যাত সন্দর্ভ 'নারীর মূল্য' রচনায় ব্যস্ত। সুতরাং অনুরোধ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিশেষত সমুদ্রপার হইতে আবার এক নূতন নিমন্ত্রণ আসিয়া তাঁহার কাছে পৌঁছিল। 'ভারতবর্ষে'র তখন আবির্ভাবের

সময়। নব জন্মোৎসব উপলক্ষে পরিচিত সাহিত্যিক মাত্রেই আমন্ত্রিত হইবেন বলিয়া জানা গেল।

সে এক মজার কথা। কোর্ট বাজারের চায়ের দোকানটিতে আমরা উভয়ে চা খাইতেছি, হঠাৎ শরৎবাবু আমাকে বলিলেন, 'ওহে সরকার! আজ প্রমথর (প্রমথনাথ ভট্টাচার্য) চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, হরিদাস (বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র) এমন একখানা বাংলা মাসিক বের করবার মনন করেছে, যার তুলনা একমাত্র বিলাতের স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন বা উইণ্ডসর ম্যাগাজিন-এর সঙ্গেই দেওয়া চলতে পারবে'—বলিয়াই পত্রখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'পড়।'

পড়িয়া দেখিলাম পত্রের ভাবটা এইরূপ,—পত্রিকার সম্পাদক হইবেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। লেখক হইবেন বর্দ্ধমানের মহারাজা এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে সুরু করিয়া ছোট বড় লেখক যিনি যেখানে আছেন এই বিরাট বাংলা মুলুকে। অর্থাৎ এমন একটা বিরাট ব্যাপার যাহা কাহারও দ্বারা এ পর্যন্ত সুসাধ্য হইয়া উঠে নাই। পত্রিকার এখনও নামকরণ হয় নাই। নামকরণ হইলেই অনুষ্ঠান-পত্র বাহির হইবে। উহাতে শরৎবাবুর নাম ত থাকিবেই, ইহা বাদে আরও অনেকের থাকিবে, যেমন সৌরীন, নিরুপমা, অনুরূপা দেবী ইত্যাদি; এইবারে শরৎবাবুর একটুখানি নাম প্রচারের সুবিধা হবে।—এই নাম বাহির হইবার উল্লেখে শরৎবাবু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি পাঠোদ্ধার করলে বল ত?'

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, 'পাঠোদ্ধার আপনিও যা করেছেন, আমিও তা বাদে আর কিছু যে করেছি তা নয়। কথাটা নেহাৎ ফেলবার মতন নয়, শরৎদা।'

'ওহে, সে কথা কি আমিই অস্বীকার কচ্ছি, কিন্তু লিখব অত পরিশ্রম

করে,—তার ওপর যে একজন সম্পাদকের দাবী রাখেন বলেই যথেচ্ছভাবে কলম চালাবেন সেটা ত সহ্য করতে পারব না।'

আমি প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, 'তা করতে যাবেন কেন বলুন ত? নেহাৎ কাঁচা লেখা হলে হয়ত দরকার বুঝে এক-আধটু কলম চালাবার দরকার হয়ে পড়ে। আপনার লেখা কি সেইরূপ মনে করেন?'

'তা ত করি নে ভাই, জানি আমি যা লিখি তার প্রতিটি কথা ওজন করেই লিখি। অনেকে যেমন যা মনে এল তাই কলমের মুখ দিয়ে বার করে দিলে, আমার কিন্তু সেটি হবার জো নেই। আমার মনেও অত হুড়মুড় করে কথা আসে না, আর যে কি ভাবে আসে তা ত দেখেই থাক। তাহলেই বুঝতে পাচ্ছ, যা লিখি নেহাৎ ফেলবার মত নয়। তবে কি জান, কাগজে বের করতে গেলেই সম্পাদকদের মতির ওপর নির্ভর করতে হয়।'

আমি পাল্‌টা উত্তর করিলাম, 'যখন দেখবেন যে একান্তই এঁদের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়, তখন হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন। সঙ্গতি হলে নিজের খরচে বই ছাপাবেন। কি বলেন এ কথায়?'

'কি আর বলবার আছে ভায়া! দেখাই যাক্ ত, দেখি কি বিরাট পত্রিকা এবার জন্মগ্রহণ করে।'—বলিতে বলিতে কতকটা আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, 'সকল ক্ষেত্রেই ব্যবসা ছাড়া কিছুই নেই।'

আমি তৎক্ষণাৎ কথাটার সূত্র ধরিয়া বলিয়া উঠিলাম 'এতেই ত মানুষকে পেশাদার করে ফেলে, একেবারে মাটি করে দেয়। আমার বিবেচনায় ভাবটি যখন মনের মধ্যে জমাট বেঁধে আসে, তখন তার যে আনন্দ লেখক নিজের মনে উপভোগ করেন, তার অর্ধেকটা হয়ত নষ্ট হয়ে যায়, যখন সেটা তার কলম থেকে বেরোয়। ছাপার অক্ষরে বেরোলেই সেটা নেহাত বাজারের পণ্যদ্রব্যের সামিল হয়ে যায়, তখন আমার ত সত্যি সত্যি মনে হয় তার মাধুর্য অনেকখানি কমে গেছে।'

শরৎবাবু নীরবে আমার কথাগুলি শুনিয়া গেলেন। পরে বলিলেন, 'কিন্তু

প্রকাশের ভেতর দিয়ে সত্যিকার সৃষ্টি-কৌশল ধরা পড়ে, নচেৎ স্রষ্টার যে রচনা-নৈপুণ্য আছে, তা বুঝব কেমন করে?'

'কিন্তু যাই বলেন, নিজের অন্তরের বস্তুটি, যা রসে পূর্ণ, ভাবুকতায় সুন্দর, কল্পনায় নিত্য নূতন, সেটাকে বিশ্ব-জগতে প্রকাশ করে রিক্ত হয়ে লাভ কি, শরৎদা?'

'লাভ নয়? জগৎকে দান করাতেই লাভ। বিশ্বস্রষ্টার কথা ছেড়ে দাও, পৃথিবীর অন্যান্য বড় লোকদের কথাও ছেড়ে দাও, ধর আমাদের ভারতবর্ষে কথা। আর্য ঋষিগণ হাজার হাজার বছর আগে জগৎকে জ্ঞান দান করে গেছেন, তার কি তুলনা আছে? বলতে চাও কি তাঁরা কোন দিন ফতুর হয়ে গেছেন,? কস্মিনকালেও নয় ভায়া, কস্মিন কালেও নয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য আমাদের দেশেই জন্মে গেছেন। তাঁদের চাইতে আর বড় লোক জন্মেছে কোথায়? তাঁদের জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বাৎসল্য ধরায় পতিতপাবনী জাহ্নবীর ন্যায় মানব সমাজকে পবিত্র স্নিগ্ধ করে গেছে। এত ত চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছ। পরমহংসদেবের শিষ্যবর্গ, একবার ভাব ত দেখি তাঁদের অসামান্য কার্য-কলাপের কথা—একবার সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে মনে মনে চিন্তা কর ত ভায়া, জগৎময় স্বামী বিবেকানন্দের মহামানবতার কথা। সমস্ত আমেরিকা কি শুধু শুধুই এই লোকটির এক চিকাগো বক্তৃতাতেই মেতে উঠেছিল? তা নয়। তারা দেখতে পেয়েছিল, যে এই অতিমানুষটি এমন একটা জ্ঞানের জ্যোতি ভারত থেকে সঙ্গে করে এসেছে, যার আলোক অচিরেই প্রশান্ত মহাসাগরের এপার, এমন কি আটলান্টিকেরও পরপারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।'

বলিতে বলিতে বাক-নিরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি থামিয়া গেলেন। আমি নেহাৎ নাছোড়—তাই পালটা জবাব না দিয়া পারিলাম না। বলিলাম, 'শরৎদা, দুটো কি এক ধরণের কথা হল। একটায় হল জগতের মহৎ উপকার কিন্তু অন্যটায়ও কি তাই হয় বলতে চান? কাব্য, নাটক, নভেল সংসার থেকে

উঠে গেলেও মানুষের কোন ক্ষতি হবে না বরং এগুলিতে মানুষকে কর্মজগৎ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে। সংসার হল কর্ম নিয়ে, এখানে এসে আলস্যপরায়ণ হয়ে জীবনটাকে অকর্মণ্য করে তুলে, দিন দিন দুঃখ দারিদ্রের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? আমাদের আর্থিক দুর্গতির মূলেই হল এই ভাব-প্রবনতা। দেখুন না, এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশের লোক—যেমন ধরুন না, বোম্বাই কেমন ব্যবসা বানিজ্যে উন্নতি লাভ করে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, আর আমাদের বাংলা, সে আছে তার কাব্য সাহিত্য চর্চা নিয়ে। ফলভোগ, হয় ম্যালেরিয়া নয় কালাজ্বরের হাতে পড়া—ভোগান্তে বৈকুণ্ঠ লাভ। তাই যদি বা হয় ত মা-লক্ষ্মী কখনো এদেশের কাউকে বৈকুণ্ঠলোকেও প্রসন্ন মনে আশীর্বাদ করবেন করবেন না। কেননা আমরা যে লক্ষ্মীছাড়া! চিরদিন ধরে আমরা কেবল ভাবুকতার দোহাই দিয়ে দিয়ে হয়ত ভাবরাজ্যেই কতকটা অগ্রসর হয়েছি, কিন্তু আমাদের জঠররাজ্য প্রতিনিয়ত যে তাড়কা রাক্ষসীর ন্যায় আকাশ-পাতাল জোড়া হাঁ করে কেবল খাব খাব করছে, বলুন ত—দমন করতে পারে এমন কোন শক্তি আমাদের মধ্যে নিহিত আছে?'

শরৎবাবু জোর গলায় কথাটার উত্তর দিলেন, 'শক্তি আছে বৈকি নিশ্চয় আছে। সে শক্তির অপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ করতে আমি বলি নে। তাই বলে আমি এ কথাও বলতে রাজী নই, যে ভারতের লোক বিশেষতঃ বাংলার লোক ভাবুকতা ছেড়ে একদণ্ড টিকে থাকতে পারে!'

'ব্যস, সুন্দর যুক্তি। আপনার দেখছি দ্বিতীয় শুকদেব হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বলতে পারেন কি, আমরা নিশ্চেষ্ট অকর্মণ্য হয়ে থাকলে আমাদের জঠরস্থ তাড়কা রাক্ষসীকে স্বয়ং বাসুদেব এসে প্রতিদিন বিনাশ করে দিয়ে যাবেন?'

'বাসুদেব আসবেন কি বলছ? তিনি যে তোমার অন্তরে থেকে প্রতিনিয়ত তোমাকে অভয় দিচ্ছেন, তোমার বিবেক বুদ্ধিকে সৎপথে চালিত করছেন, এটা কি তুমি কিছুই মনে কর না?'

জানি না কি কারণে এ প্রশ্নের উত্তর আর আমার মুখে যোগাইল না।

নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টি অবনত করিলাম।

'রামের সুমতি' ও 'পথ-নির্দ্দেশ' যমুনায় প্রকাশিত হইলে, শরৎবাবু নূতন গল্প 'বিন্দুর ছেলে' ও সেই সঙ্গে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ লেখা আরাম্ভ করিলেন। 'বিন্দুর ছেলে' যে সময় লেখা হইতেছিল, ঠিক্ ঐ সময় রবীন্দ্রনাথের 'রাসমনির ছেলে'ও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল, গল্পটির বিষয় শরৎবাবুকে আমি প্রসঙ্গচ্ছলে একদিন মাত্র বলিয়াছিলাম। তাহাতে শরৎবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ছাখ ত দেখি আমার এ গল্পটা কেমন হচ্ছে? আমার ত আর দু দুটো গল্প লেখার পরে এতটুকুও লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে না—তুমি কি বল? যদি ভাল লাগে ত, লিখি। আমার নিজের কাছে কিন্তু বড়ই 'ডাল্' মনে হচ্ছে।'

কিস্তি মত যেদিন যতটুকু লেখা হইতে লাগিল, ততটুকু পড়িতে লাগিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, এই 'বিন্দুর ছেলে' গল্প আমার কাছে পূর্বের গল্প দুইটি হইতেও ভাল লাগিল। কিন্তু লেখক আমার উক্তি যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহার নিজের কাছে 'পথ-নির্দ্দেশই' এই তিনটির মধ্যে ভাল লাগিল। ইহার কারণ, তিনি যাহা দর্শাইলেন তাহাও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়। আর্ট হিসাবে 'পথ-নির্দ্দেশ' গল্প যে শ্রেষ্ঠ, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। বিশেষতঃ গুণী ও হেম চরিত্র দুইটি যে ভাবে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে চরিত্র দুটিকে ওভাবে আনিয়া উপসংহারে দাঁড় করানো খুবই শক্ত ব্যাপার। যথাসময়ে 'বিন্দুর ছেলে' গল্প 'যমুনা'য় বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে লেখকের যশোগানে পাঠকমহল আরও মুখর হইয়া উঠিল। শরৎবাবুর 'নারীর মূল্য' একটু একটু করিয়া 'যমুনা'তে বাহির হইতে লাগিল। এই 'নারীর মূল্য' সম্বন্ধে একটুখানি ইতিহাস আছে। সেইটি হইতেছে এই—শরৎবাবু যে 'নারীর ইতিহাস'

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা গিয়াছে সেই প্রবন্ধ হঠাৎ গৃহদাহে নষ্ট হইয়া যায়, তৎসঙ্গে তাঁহার মহাশ্বেতার ছবিখানিও যায়। এই নষ্ট প্রবন্ধটিকে পুনরুদ্ধার মানসে লেখক নূতন প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে লিখিতে সুরু করিলেন। "ভারতবর্ষ" তখনও বাহির হয় নাই। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র-লাল বলিয়াছিলেন, 'নারীর মূল্য' অমূল্য। তোমরা এ লেখককে হাত করবার চেষ্টা কর।' নূতন লেখকের পক্ষে ইহার চেয়ে বড় রকমের সার্টিফিকেট কে কখন আশা করিতে পারে!

সকলেই জানেন যে, এই 'নারীর মূল্য' শ্রীমতী অনিলা দেবীর নামে 'যমুনা'য় প্রথম বাহির হয়। এ প্রবন্ধেরও পূর্ববৎ আমিই পাঠক। প্রথম কিস্তি লেখা হইলে লেখক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল ত এ লেখা কার নামে বার হবে?'

আমি সে কথায় একটুখানি হাসিয়া জবাব করিলাম, 'সেটা আমি কি করে বলব, বলুন ত?'

'যাও, বলতে পারলে না! আমার দিদির কথা তোমাকে বলি নি বোধ হয়! এ লেখা আমি তাঁর নামেই বের করব। তিনি বেশ ভাল লেখাপড়া জানেন। তবে সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে চর্চা করবার সময় পান না।'

লেখা অনিলা দেবীর নামেই বাহির হোক, কিম্বা অপর কোন নামেই হোক, এর মধ্যে যে শরৎবাবুর হাতের ছাপ ছিল, এরূপ অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে এই নামেই লেখকের কলম হইতে 'নারীর লেখা', 'ইতিহাসে কানকাটা' প্রভৃতি অম্ল-মধুর রচনাও যমুনায় বাহির হয়। বলা বাহুল্য তখনকার ক্ষীণাঙ্গী যমুনার কলেবর প্রায়ই শরৎবাবু একা পূর্ণ করিতেন, কখনো স্বনামে কখনো অন্য-নামে। এই নারীর মূল্যের প্রথম দফা 'যমুনা'য় বাহির হইবার পর, এক চায়ের দোকানে কয় বন্ধুতে কথাবার্তা হয়। কথায় কথায় শরৎবাবুই প্রথম

বলেন, 'আমি শুধু নারীর মূল্য লিখেই যে এ ধরণের লেখা শেষ করব তা নয়। এর পরে জীবনের মূল্য, প্রেমের মূল্য, ধর্মের মূল্য নাম দিয়ে পর পর বারোটি প্রবন্ধ লিখে তার নাম দেবো দ্বাদশ মূল্য। কথাটা শুনিয়া উপস্থিত বন্ধুদের মধ্য হইতে বিভূতিবাবু আনন্দে গদগদ হইয়া বলিয়া উঠেন, 'বেড়ে প্লান এঁটেছ শরৎদা, যদি সমাধা করতে পারো ত একটা কাজের মতন কাজ হয়। কিন্তু কৃপণ লেখক সেই যে আমাদিগকে কথা দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন ওই পর্যন্তই। জানি না, তাঁহারই মনের ভুল, না আমাদেরই অদৃষ্টের দোষ, তাঁহার প্রতিশ্রুত অবশিষ্ট মূল্যগুলি আমরা আর পাইলাম না।

যথাসময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিকৃতি সহ জলধরের শোকাশ্রুশিক্তা 'ভারতবর্ষ' অমূল্য রচনাবলী ও চিত্র মণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইল। পত্রিকার সৌষ্ঠব-শ্রীতে সকলেই মুগ্ধ হইল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের বিয়োগ বেদনায় পাঠকমাত্রেই বলিতে লাগিল, 'হায় হায় কি দুর্ভাগ্য!'

ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের কোন রচনা প্রকাশিত হয় নাই, যেহেতু তখন তিনি উহার পরিচালকবৃন্দের নিকট অপরিচিত। পরলোকগত প্রমথবাবুই চিঠি-পত্র দ্বারা শরৎবাবুকে ক্রমাগত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শরৎবাবু সে সব উৎসাহে তেমন আগ্রহের সহিত 'ভারতবর্ষে'র জন্য কোন গল্প বা প্রবন্ধ লিখিলেন না, কিম্বা বন্ধুকেও এমন কোন আশা-ভরসা দিলেন না যে, অদূরভবিষ্যতে তিনি 'ভারতবর্ষে'র জন্য লেখনী ধারণ করিবেন; বরং এমন এক কাজ করিয়া বসিলেন, যাহাতে বন্ধু এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে 'ভারতবর্ষে'র দল একটুখানি অপ্রস্তুত হইলেন। এখানকার একটি দোকান হইতে নগদ মূল্যে এক কপি ভারতবর্ষ ক্রয় করিয়া সংবাদটি বন্ধুবরকে জানাইলেন। বন্ধুবর মহা লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ এককপি পত্রিকা ত পাঠাইয়া দিলেনই, বরঞ্চ সেই সঙ্গে 'ভারতবর্ষে'র তরফ হইতে নানারূপ ত্রুটি

স্বীকার করিয়া লেখা পাঠাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধও করিলেন।

'চরিত্রহীন' তখনও সারা হয় নাই। যতটা লেখা হইয়াছিল, ততটাই বন্ধুকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যখন মাসকয়েক পরে পাণ্ডুলিপিখানি ফেরৎ আসিল, উহাতে আমরা এতটুকুও আশ্চর্য বোধ করিলাম না, কেন না, 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'র পর সর্বসাধারণের মন যে সহজে 'চরিত্রহীনে'র প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এরূপ মনে করাই ভুল। অবশ্য "যমুনায়" উক্ত উপন্যাসের কিয়দংশ পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত গল্পোপন্যাসের মধ্যে 'বিরাজ বৌ' তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা। দ্বিতীয় ষাণ্মাষিক সংখ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে এই উপন্যাসখানা 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক রূপে বাহির হয়। বইখানা এতই ভাল লাগিয়াছিল সকলের কাছে, যে, কেহই বিরাজের ঐ সাময়িক অধঃপতনটুকু সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। এ সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপি পাঠকালে আমরাও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আপত্তি টিঁকে নাই। যতদূর মনে পড়ে বলিয়াছিলাম, 'আচ্ছা, বিরাজ ত আত্মঘাতিনী হইতে গিয়াছিল, যদি সে হাত পা বাঁধা অবস্থায় আধমরার ন্যায় জল দিয়া ভাসিয়াই যাইত, আর সেই অবস্থায়ই মৎস্যশিকারী জমীদারপুঙ্গবটি তাহাকে বজরায় তুলিয়া লইত, বিরাজের পক্ষে কি সেটা কম পাপ হইত? হিঁদুর ঘরের মেয়ের স্বামীর উপর অভিমান করিয়া গৃহত্যাগ, তারপর আত্ম-হত্যার চেষ্টা, সর্বনাশ! এ দুটির চেয়েও কি আর পাপ কাজ আছে নাকি হিঁদুর শাস্ত্রে? স্বামীর উপর অভিমান করিয়া কুল-ত্যাগ করাটায় যেন মনে হয় ইস্টলীন-এর কতকটা ছায়া পড়িয়াছে, যদিচ সেটা অন্য রকমের ব্যাপার?'

(যতদূর মনে পড়ে, গ্রন্থকার একথায় উত্তর দিয়াছিলেন, 'সংসারে অসম্ভব বলে কিছু নেই। যারা শেক্‌সপীয়র পড়েছে ভাল করে, তারা এ কথার প্রমাণ দিতে পারবে বেশী করে। বলতে পার শেক্‌সপীয়রের চাইতে নর-নারীর চরিত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি জন্মেছে এ যাবৎ পৃথিবীতে?')

এত বড় নজিরের উল্লেখে আর কথা বলিতে সাহস হইল না, চুপ করিয়া রহিলাম।

এই 'বিরাজ বৌ' বই লিখিতে লেখকের মাসাধিক কাল লাগিয়াছিল। অত ধৈর্য ধরিয়া, অত কাটাকুটি করিয়া লেখা খুব কম লেখকের পক্ষেই সম্ভবপর। লেখক আমাকে বলিতেন, 'ছাখ যতক্ষণ না আমার এক্সপ্রেসন-টা সহজ এবং ঝরঝরে মনে হয়, ততক্ষণ কিছুতেই আমার তৃপ্তি হয় না। রাত্রির লেখা দিনের বেলা ভুল বলে মনে হয়।'

এ ভুল ব্যাকরণ বা অভিধান-মূলক নয়, কেন না এরূপ ভুলের হাত থেকে আমাদের বক্ষ্যমান লেখক এবং বর্তমান অনেক লেখকই নিস্তার পান নাই।

পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে এ কিসের ভুল? এ প্রশ্নের উত্তর হইতেছে—ভাবানুযায়ী ভাষা প্রয়োগের অভাব, অর্থাৎ যাহাতে আন-সায়েন্টিফিক হইয়া দাঁড়ায়, ঠিক তাই। পল্লীগ্রামের কথাবার্তার ভাষা চলতি বাংলা, সেই বাংলাকে যদি কোন কাব্যতীর্থ বা বিদ্যাম্বুধি সংস্কৃত ঘেঁষা করিয়া তোলেন ত তাহার অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায়, তাহা যেমন সর্বসাধারণ্যে সহজভাব প্রকাশের পরিপন্থী হয়, ঠিক সেইরূপ। মোট কথা, যেটি যেমন, তেমনই হওয়া চাই, অর্থাৎ নাট্যকারের পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই 'বিরাজ বৌ' যখন লেখা হইতেছিল, তখন আমাদের অফিসের সামনে রাস্তার ওপারে চৌধুরী মহাশয়ের দোকানে, বইয়ের প্রথম কিস্তি 'ভারতবর্ষে' পাঠাইবার সময় লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি নাম দেওয়া যায় বল ত?'

বলিলাম, 'কেন, 'বিরাজ মোহিনী' বেশ নাম!'

'না হে' ওর চেয়ে সোজা 'বিরাজ বৌ' নামই আমার পছন্দ-সই। মোহিনী চরিত্র তেমন ইম্পর্টাণ্ট নয়। থাক গে কাজ নেই আর ও নামটা এর সঙ্গে জড়িয়ে।'

আমার উত্তর জোগাইল, কহিলাম—'অর্থাৎ প্রথম দফায় যোগেন চাটুয্যের

'কনে বউ', দ্বিতীয় দফায় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ', আর তৃতীয় দফায় শরৎ চাটুয্যের 'বিরাজ বৌ'—এই ত ?'

'তা হোক্ হোক! ওই ত তোমাদের কেমম একটা রোগ। তাঁদের 'কনে বউ', 'মেজবউ' যত খুশি থাকে থাক, তাতে আমার লোকসান আছে কিছু ?'—বলিয়াই নীল পেন্সিল দিয়া বড় বড় অক্ষরে 'বিরাজ বৌ' নাম পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতায় লিখিয়া দিলেন, নীচে লিখিলেন—ছোট ছোট অক্ষরে 'গল্প'।

আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, 'তা হবে না, প্রমথ ভট্টাচার্যের চিঠির কথা মনে নেই ? লিখুন 'উপন্যাস।'

লেখক এবারে আর কোন আপত্তি করিলেন না—গল্প কাটিয়া স্পষ্ট করিয়া আরও বড় বড় অক্ষরে লিখিলেন—উপন্যাস।

ভালো গল্পের বই যত বড়ই হোক, একখানা ছোটখাটো ভালো উপন্যাসের আদর যে উহার চেয়ে ঢের বেশী তাহা প্রথম জানা গেল প্রমথবাবুর চিঠিতেই। সেই জন্যই 'বিরাজ বৌ'কে উপন্যাসের পংক্তিতে ফেলা গেল। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', প্রভৃতি গ্রন্থের মূল্য বাজারে যতই হোক 'বিরাজ বৌ-এর মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী হওয়ার সম্ভাবনা, এই কথাটাই উক্ত বন্ধু শরৎ-বাবুকে একাধিক চিঠি লিখিয়া জানাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ আভাষও ছিল —যা পাও তাই নিয়ে দিয়ে ফেল। হরিদাস হাতে থাকলে চাই কি কালে লাল হতে পার। এ সম্বন্ধে কয়দিন পরামর্শও চলিল। শেষে শরৎবাবু যাহোক একটা সম্মতিসূচক উত্তর দিয়া ফেলিলেন। আমি একটুখানি টিপ্‌পনী কাটিয়া বলিলাম, 'মন্দ কি শরৎদা, বটতালিক লেখকেরাই যদি নামজাদা পাবলিশারের জোরে ভদ্রসমাজে নাম জাহির করতে সক্ষম হয়, ত আপনার দেখছি পাথরে পাঁচ কিল। আপনি এক কাজ করুন, হোমিওপ্যাথিক ডোজে ভারতবর্ষে

লেখা ছাড়তে থাকুন। তারপর এ বছরের লেখাটা যদি গড়িয়ে ও-বছরে নিয়ে ফেলতে পারেন ত আপনাকে পায় কে? আর একটা কাজ করতে হবে, তাগিদের পর তাগিদ না পেলে লেখা কাগজে পাঠাবেন না, ও না হলে লেখার কদর কমে যাবে, সেই সঙ্গে আপনারও নাম একটুখানি খারাপ হয়ে যাবে।' কথাটা অবশ্য রহস্য করিয়া বলিলাম।

শরৎবাবুও রহস্যটুকু বুঝিতে পারিয়া একটুখানি হাসিয়া জবাব করিলেন, 'বাধ্য হয়ে হোমিওপ্যাথিক ডোজে লিখতে হবে। দেখছ না কলকাতার এক 'ভারতবর্ষে'র ঠ্যালাতেই অস্থির, পরে 'যমুনা' আছেন, এর ওপর আবার ঢাকা থেকে অনুরোধ এসে হাজির। প্রফেসর সত্যেন ভদ্রর 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' নামে একখানা ইংরাজী-বাংলা কাগজ আছে তাতেও লিখতে হবে।'

ঠিক মনে পড়ে না, শরৎবাবু উক্ত পত্রিকায় কিছু লিখিয়াছিলেন কি না। তবে কয়েক মাস যাবৎ বিনামূল্যে পত্রিকা পাইয়াছিলেন।

যখনকার কথা বলিতেছি, ঠিক এইরূপ সময়েই একদিন শরৎবাবু 'গুরুশিষ্য সংবাদ' নাম দিয়া একটি রচনার প্রথমার্ধ লিখিয়া আনিয়া আমাকে বলিলেন, 'ছাখ হে, এই লেখাটার শেষার্ধ তোমাকে লিখতে হবে।'

'দেখিই আগে আপনি বা কি লিখছেন, আর আমাকেই বা কি লিখতে এমন আদেশ কচ্ছেন'—বলিতেই তিনি হাসিতে হাসিতে এক খণ্ড কাগজ হাতে দিয়া বলিলেন, 'ছাখ ত একবার পড়ে। তারপর আমাকে বলো এ এ রকম লেখা পড়ে লোকে গাল দেবে না ত?'

পড়িয়া উত্তরে বলিলাম, 'গাল নিশ্চয়ই দেবে?'

'আচ্ছা, দেয় দিক। লেখ ত দেখি শেষটুকু কেমন দাঁড়ায়।'

বলিলাম, 'কেমন আর দাঁড়াবে? তেলে জলে কি কখনো মিশ খায় শরৎদা! দেখা যাক কি করে উঠতে পারি।'—বলিয়াই, তাঁহার কথা রক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ কালি কলমের শরণাপন্ন হইলাম।

যা নয় তাই লেখা শেষ হইলে দেখা গেল, তাঁর খানিতে চোখালো-

চোখালো বানের খোঁচা, আমার খানিতে তার একান্ত অভাব, বরং গম্ভীরী চালের শ্লেষ। সম্পূর্ণ লেখাটা কয়েকজন বন্ধুতে পড়িলেন। পড়িয়া নানারূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশ্য আমাকে বাঁচাইয়া তাঁহারা যত মতের চোট ঝাড়িলেন শরৎচন্দ্রের একার উপর। ইহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'না হে সরকার, কাজ নেই এ লেখা ছাপিয়ে। লেখাটায় রবিবাবুর ওপর খোঁচা আছে, তা সকলেরই চোখে পড়বে।'

এ প্রস্তাবে কতদূর খুশী হইলাম, তা বলা যায় না। মনে হইল একটা মস্ত বিপদ কাটিয়া গেল।

কিন্তু জানি না কেমন করিয়া এই লেখারই প্রথমার্ধ 'যমুনায়' অনিলা দেবীর নামে বাহির হইল এবং সেই উপলক্ষে 'ঢাকা রিভিউ সম্মিলন' লেখককেও একহাত লইতে কসুর করিল না। বোধহয় অনিলাদেবী যে শরৎচন্দ্রেরই ছদ্মনাম, ইহা উক্ত পত্রিকার জানা ছিল, তাই লেখা না পাইয়া লেখকের উপর একটুখানি ভালমত গায়ের ঝাল মিটাইয়া লইবার সুযোগ কিছুতেই সে ত্যাগ করিতে পারিল না, বেশ কড়া কড়া দুই কথা শুনাইয়া দিল।

শরৎবাবুকে উক্ত সমালোচনাটা দেখাইতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ছাখ হে? ওসব কি আর গায়ে মাখতে আছে। কতজনে কত রকম বলবে। কোনটার বা জবাব করতে হবে, কোনটা বা শুনে সেরেফ চুপ করে থাকতে হবে।'

'দেখলেন ত, খোঁচাটা বড় কম দিলে না।'

'ও দেবেই। এ ক্ষেত্রে নামলেই খেঁাচা দিতেও হবে, খেতেও হবে। নইলে চলবে কেন? দেখব আরো কত।'—বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

বুঝিলাম অনিলা দেবীর নামে তাঁহার যে দুই-একটি ছোটখাটো সমালোচনা পর্যন্ত 'যমুনায়' বাহির হইয়াছে, তাহার অম্ল-মধুর রস আস্বাদনে এক-

দিকে পাঠক যেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই ক্ষুণ্ণও যে কেহ না হইয়াছে এমন নয়। বিশেষতঃ 'নারীর লেখা' নামক সমালোচনাটিতে। কেন না যে সমস্ত লেখিকার লেখার তিনি সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের ভক্ত পাঠকের একান্ত অভাব ছিল না। বিশেষতঃ দুই একজন লেখিকা ছিলেন শরৎবাবুর অন্তরঙ্গ-স্থানীয়া। কি জানি যদিই অনিলাদেবীর ছদ্ম নামটি খুলিয়া গিয়া লেখকের স্বরূপটি একদিন সর্বসমক্ষে ধরা পড়িয়া যায়, তবেই ত মুস্কিল।

লেখকের অদৃষ্ট খুব সুপ্রসন্ন, তাই এক 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' বাদে অন্য কোন পত্রিকাই কোন উচ্চবাচ্য করিল না।

একদিন কথা প্রসঙ্গে শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা শরৎদা আপনি যে এত সুন্দর গল্প লেখেন, এর প্লট তৈরী করতে আপনাকে মেহনৎ করতে হয় না?'

উত্তরে বলিলেন, 'মোটেই না, এই ত রাস্তা দিয়ে ভিড় ঠেলে চলেছি, এরই মধ্যে পাঁচ, সাত, দশমিনিটে আমি একটা প্লট মনে মনে গড়ে ফেলি। লিখতে গিয়ে হয়ত আকার ও গঠন দুটোই তার অনেকটা বদলে যায়; কিন্তু মূল প্লট প্রায়ই ঠিক থাকে।'

মনে মনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলাম, 'আমার ত প্লট মাথায়ই খেলে না।'

তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, 'তাহলে গল্প লিখতে যেয়ো না কবিতাই লেখ।'

পরে বলিলেন, 'দ্যাখ গল্পের প্লট তৈরীই বড় কথা নয়, আসল কথা হল বক্তব্য বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলা চাই। অনেক সময় এক্সপ্রেশন-এর ওপরই ভালমন্দ নির্ভর করে। আমার গল্প যে তোমার ভালো লাগে বল, এর প্লট ভাল, না এক্সপ্রেশন-ই ভাল? বলত!'

'বোধ হয় এক্সপ্রেশন-ই ভাল শরৎদা।'

শরৎবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'গ্যাখ, শক্তি হয়ত অনেকেরই ভেতর আছে, কিন্তু সে শক্তি বিকাশের কোন অবসরই তার জীবনে ফুটে ওঠে নি, তাই শক্তি থাকতেও বাধ্য হয়ে তাকে শক্তিহীনের মতনই থাকতে হয়। আবার এমন অনেকে আছেন, যাঁদের ভেতরের শক্তি বিন্দুমাত্রও থাকে ত কি বলি, অথচ তাঁদের লেখক হবার এমন সখ যে তা আর তোমাকে কি বলব ভায়া! পরের লেখা হুবহু চুরি করে এক আধটি নাম মাত্র বদলিয়ে ফেলে লেখক-নাম জাহির করবার জন্যে এমন করে উঠে পড়ে লাগেন যে, তা দেখে হাসিও আসে দুঃখও পায়। কাগজে বের করবার চেষ্টা করলে সময় সময় ধরা পড়েও যান, পুঁথি করে বের করলে ত কথাই নেই। আসল যা, দুনিয়ায় তা-ই কেবল টিঁকে থাকবে, নকল কস্মিনকালেও থাকবে না। এ কি সাময়িক উত্তেজনা বা মাদকতার কাজ রে ভায়া। মানুষের চিত্তরাজ্যে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলারও যেমন স্থান, তেমনি তোমার দেস্‌দিমোনা, মিরান্দা, ওফেলিয়ারও স্থান। খাঁটি সোনা যা, তা তোলা রতি মাষার ওজনেই চিরদিন ধরে বিকাবে মণের ওজনে নয়, তা তোমার দুনিয়া থাক আর যাক। যার গলায় সুর নেই, তার পক্ষে যেমন কণ্ঠ-সঙ্গীত আরম্ভ করা একরূপ পণ্ডশ্রম বলেই মনে হয়, তেমনি যার ভেতরে কখনো কবিত্ব বলতে কিছু নেই, তার পক্ষেও কবিতা রচনা করা ব্যর্থশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। নকল করতে গিয়ে যা হয়, তা ওই ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত দাঁড়কাকের মতন। কতকটা কেমন বেখাপ্পা গোছ। পরশপাথর যেমন লোহাকে সোনা করে দ্যায় বলে শোনা যায়, তেমনি পরশপাথর হুবহু ভাবুক-কবির চিত্তকে সোনা করে দেবেই।' বলিতে বলিতে একটুখানি থামিয়া গিয়া শরৎবাবু বলিলেন, 'গ্যাখ হে, আমাদের 'কর' নাকি কি লিখতে সুরু করছে; বলছে আমাকে দেখতে, যদি সুবিধা হয় ত তুমিও দেখতে পাবে।'

বলিলাম, 'বেশ ত।'

বাবু কুমুদিনীকান্ত কর আমাদের অফিসেই কাজ করেন। তিনি যে লিখিতে পারেন, তাহা কাহারও জানা ছিল না। হঠাৎ এখানকার বেঙ্গল ক্লাবে একটি জাঁকালো গোছের সাহিত্য-সভা হইল। স্বদেশী বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন কার্যব্যপদেশে তখন এখানে। শরৎচন্দ্র সভাপতি হইবেন, সকলেই খুব উৎসাহিত। 'ভাষার জয়' ও 'কণ্ঠসঙ্গীত' নামক দুইটি গান এই উপলক্ষে রচিত হইল। পূর্বটি আমার, পরবর্তীটি কাহার তাহা বলিতে পারি না। বন্ধু বেণীমাধব গাঙ্গুলীর উৎসাহে গান দুইটি এবং তৎসঙ্গে প্রোগ্রামও ছাপান হইল। এখানকার অপর একজন সাহিত্য-রসিক অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন। অনেকে অনেক প্রবন্ধ পড়িলেন। এইসভায়ই কুমুদিনীবাবু একটি রচনা পড়েন। আমি 'প্রতাপাদিত্য' নামক একটি বড় কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম।

সে সভায় শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি ভালই হইয়াছিল। কিন্তু তিনি (সভাপতি) যেরূপ নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছিলেন সেদিন, সে কথা স্মরণ করিলে তাঁহাকে নিতান্তই দয়া করিতে ইচ্ছা হয়। সের দেড়েক ওজনের একটি প্রকাণ্ড ফুলের মালা তাঁহার গলায় চাপানো। তাহার ভারে না পারেন সোজা হইয়া দাঁড়াইতে, না পারেন ভালোমত অভিভাষণ পড়িতে। আমাকে বলিয়াছিলেন কাছে বসিতে ; কেন না যদিই পড়িতে গিয়া তেমন বাধিয়া যায় কিম্বা ঠেকিয়া যায় ত তাঁহার বদলে অভিভাষণ আমিই পড়িয়া দিব। বহু কষ্টে তাঁহার কার্য সমাধা হইলে তিনি ত বাঁচিলেনই, আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

।। সাত ।।

শরৎবাবুর ও আমার খুব হাঁটার অভ্যাস ছিল। আমরা দুইজনে যেমন লোকজনের ধাক্কা খাইতে খাইতে কখনও বা ফুটপাথ ধরিয়া, কখনও বা রাস্তার একপাশ দিয়া জনতাসিন্ধু মথিত করিয়া চলিতাম, তেমনি সময় সময় একটুখানি নিরিবিলিতে আরাম উপভোগের জন্য সহরের একটু বাহিরে খোলা জায়গায়ও বেড়াইতাম। সেদিন খেয়াল হইল রয়াল লেকের চারপাশে ঘুরিয়া বেড়াইবার।

উপরোক্ত উত্তরমুখী রাস্তা ধরিয়া উভয়ে কথাবার্তা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিলাম। তখন অপরাহ্ন। লেকের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিতেই একবার মনে হইল রোইং-এর কথা, কিন্তু আমাদের পরিচিত 'জন'কে দেখা গেল না। অন্য লোক অবশ্য যে না ছিল, এমন নয়। কিন্তু রোইং-এর কথা তুলিতেই শরৎচন্দ্র একটুখানি শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'না হে, এই সেদিন হল বেলা দশটার সময় আমাদের অফিসের সীতারাম আয়ার রোইং করতে এসে এই লেকের জলে ডুবে মরেছে; আবার কোন সাহসে অমন কথা বলছ, বল ত?'

কিন্তু কিই বা করা যায়? অগত্যা সময় ক্ষেপণের জন্য পায়চারি করিতে করিতে ভাবিয়া দেখিলাম, কথাটা নেহাৎ মন্দ নয়। তখন বর্ম্মাদেশের আচার-পদ্ধতি রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইল। কাহারও কোন আচার পদ্ধতি একজনের কাছে বিসদৃশ ঠেকিলেই যে সেটা মন্দ, এমন কথা কিছুতেই বলা সঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে আমিই প্রথমে বলিলাম, দেখুন দেশে থাকতে আপনিও হয়ত কত বামনাই ফলিয়েছেন, আর আমিও যে কম ফলিয়েছি এমন কথা বলছি না। বরঞ্চ যথেষ্টই ফলিয়েছি; কিন্তু এখন অভাবের তাড়নায় এই

সুদূর মগের মুলুকে এসে পড়তে হয়েছে তখন বলুন ত, সে সব আচার অনুষ্ঠান কার কতখানি বজায় আছে? দেশে যাদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হলে স্নান না হোক অন্ততঃ কাপড় চোপড় ছেড়ে হাত পা ধুয়ে বার দশেক গায়ত্রী জপ না করলে যার মন শুদ্ধ হত না, সেই লোকটাই যখন সেই অস্পৃশ্য জাতের তৈরী চা রুটি এখানকার জাতের সঙ্গে একত্রে বসে অম্লানচিত্তে খেয়ে যাচ্ছে তখন বলতে চান কি, কাজটা খুবই অন্যায় হচ্ছে? আমার ত মনে হয়, যতই ব্যক্তি-গত সংস্কারের শেকল ছিঁড়ে যায় ততই ভাল। সবচেয়ে ভাল যদি সমাজেরও—'

শরৎবাবু এবারে আমাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'সমাজেরও শেকল ছিঁড়তে বল? সর্বনাশ। শেকলের জোরেই সমাজ টিঁকে আছে। এই শেকল ছিঁড়ে গেলে যে একমুহূর্তেই সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। তখন আর আমার সমাজ, অমুকের সমাজ বলে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, সেটা কি ভাল? এই থাকাটার মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য, স্বাতন্ত্র্যই বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এতে আমি এমন কথা ভুলক্রমেও বলতে চাই নে, যে নশ্বর সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখতে হবে। সবারই ভেতর একটা না একটা বড় আদর্শ আছেই,—সেটার সঙ্গে তোমার আদর্শের মিলের অভাব থাকলেই সেটা যে তুচ্ছ 'হেয়' হবে, এমন কথা বলতে পারব না। কেন না কোটী কোটী মানুষ যেটাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখছে, অন্তরের অনুভূতি দিয়ে পরখ করে নিয়ে মেনে চলেছে, বলতে চাও কি সেটা খুবই খারাপ? আমি হিন্দু, বর্ণাশ্রম ধর্ম মানি, তাই বলে যারা অসবর্ণে বিয়ে করে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছে, তাদের ত আমি কোন মতেই নিন্দা করতে পারি নে। বিবাহটা আমাদের শাস্ত্র-মতে খুব একটা ধর্মের কাজ, কেননা বিবাহিত জীবন যাপন করার নাম-ই হচ্ছে সংসার-ধর্ম পালন।—বড়ই আমরা সংসারের ধর্ম পালন করছি। কোনরকমে একটা দায় শোধ দিয়ে যাচ্চি। তাই বলে আমি একথা বলছি নে যে গোড়ায় উদ্দেশ্য কারো মন্দ ছিল। রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ, যে কারণে হোক, সমাজ যে তার দ্বারা উন্নত হয় নি, একথা আমি বলতে চাই নে। এখন

কোথায় বা রাঢ়ী বারেন্দ্র ? সবই প্রায় মিলে-মিশে যাবার জো হয়েছে। সামাজিক আদান-প্রদান, পংক্তি-ভোজনও অনেক জায়গায় চলেছে, কেবল ওই যাতে সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় সেই জায়গাটাতেই যত তফাৎ। এইটেই ভণ্ডামী। কনোজের পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধর সবাই, তবে কেন আজ বল্লালী ব্যবস্থাকে অত উঁচু করে ধরি, যে যার মতে নিজেকে মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে পরস্পরের মধ্যে একটুখানি ফাঁক রেখে যাচ্ছি, বিশেষতঃ এই যুগে ?'

আর কথা বলিবার অবসর হইল না হঠাৎ তাকাইয়া দেখি দিগ্‌দিগন্ত কালো মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, হয়ত শীঘ্রই ঝড় উঠিবে। তখনই উভয়ে দ্রুত-পদে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইল না। রাস্তার পাশেই একটি চায়ের দোকান চোখে পড়িল, চক্ষের পলকেই টিনের চালের উপর বৃষ্টি পড়িতে লাগিল ঝম্ ঝম্! আমরা সেখানে গিয়া উঠিলাম।

যেমনি ঝম্ ঝম্ করিয়া অজস্র ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তেমনি ডুম্ ডুম্ শব্দে আকাশের বুকে মেঘের কামান গর্জিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহোদর পবনদেবও আসিয়া জুটিলেন। দেখিতে দেখিতে চোখের সাম্‌নে কয়েকটা বড় বড় গাছ মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শরৎচন্দ্র দোকানের মালিক 'কাকা'কে দুই পেয়ালা চা ও আনুষঙ্গিক কিছু আহার্যের জন্য অর্ডার দিলেন। দেবতাদের যে অত্যাচার, কে বা কার চা রুটী খায়, প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতে লাগিল দোকানের সেই ছোট টিনের ঘরটির আয়ু যেন শেষ হইয়া আসিতেছে।

শরৎবাবু আমার রকম দেখিয়া মন্তব্য করিলেন, 'ওহে সরকার! চা টা যে একেবারে জল হয়ে গেল! তবে কি কাকাকে ফিরিয়ে নিতে বলব ? একটুখানি গরম খেয়ে নিলে শরীর একটু চাঙ্গা হত হে।'

অগত্যা চা ও আহার্য উদরস্থ করা গেল। দোকানের কাকা বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'বাবু, যতক্ষণ না ঝড়-জল থামে, তোমরা নির্বিবাদে আমার দোকানে থাক।'

ঘণ্টাখানেক পরে শুষ্কখাত জলে ভরাট করিয়া, রাস্তাঘাট পঙ্কিল করিয়া কলস্ত বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া যখন ঝড় ও বৃষ্টি থামিল তখন প্রায় সন্ধ্যা।

সে সময় বল্‌কান যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। কাকার দোকানে টাঙ্গানো দার্দে-নেলিজের একখানা ছবি ছিল, সেখানার উপর নজর পড়িতেই শরৎবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'সেদিন বলি নি হে! তোপের মুখ থাকে ওপর দিকে তোলা, এইবারে তার হাতে হাতে প্রমাণ পেলে ত? ভাখ, আমি না জেনে কোন কথা বলি নে।'

শুধু সংক্ষেপে জবাব করিলাম, 'সে কথা আর আমায় বলেন কেন? চলুন এইবারে ওঠা যাক!'—বলিয়াই আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। অগত্যা শরৎবাবুকেও উঠিতে হইল। কাকাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া আমরা যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, তখনও কাকা আমাদের পিছন পিছন কতকটা দূর আসিল, শেষ বিদায়ের সময়ও আমাদিগকে তাহার মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে কসুর করিল না।

শরৎবাবু আমাকে একটুখানি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, 'তুমি বোধ হয় কাকার ব্যবহারে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছ সরকার?'

'একটুখানি হয়েছি বই কি শরৎদা! নইলে মিথ্যে কথা বলতে হয়।'

আমার জবাবটার প্রতিবাদ-ছলে তিনি বলিলেন, 'ভাখ সংসারে একটুখানি বাহ্যিক নিষ্ঠা বা সদ্‌ব্যবহার দেখলেই কাউকে ভালমানুষ বলে ঠাওরান মস্ত ভুল। কে জানে ঐ কাকাই একটা গুণ্ডার সর্দার নয়। তোমরা ত রেঙ্গুন সহর ছাড়া বাইরে আর কোথাও এক পাও বাড়াও নি—তাই নানারকম মানুষের সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান খুবই কম। যেতে একবার ইউ. পি, পাঞ্জাব, এমন কি বেহার অঞ্চলে, ত দেখতে পেতে মানুষের ব্যবহার। বাইরের মানুষটি, যে ভেতরকার মানুষটির একটি আলাদা ছাঁচ তা টের পাওয়া যায় ঐ সব দেশেই; অবিশ্যি ভাল মানুষও খুবই আছে—তা না বললে ডাহা মিথ্যে কথা বলা হয়?'

প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, 'কিন্তু কাকাকে ত সে রকম মনে হল না।'

'না হতে পারে—সে রকম। আমি ত, 'কাকা' যে মন্দমানুষ তা বলছি নে। তবে জান কি, লোকটা ভারী চালাক, তোমাদের সেই বোট-চালক জনের চেয়েও। জন মুখে বলে সামনের রবিবার তার 'বোটে' শুভ পদার্পণ করতে হবে। এ লোকটা নয় মুখফুটে তাই বলে না,—নইলে এর হাবভাব কথাবার্তার কায়দায় কি মনে হয় না, যে এ লোকটাও 'জনে'রই মতন এর দোকানে আমাদের হামেশা শুভ' পদার্পণ করবারই অনুরোধ জানালে? ওর ব্যবসাদারী পদে পদে। নইলে আমরাই বা ওর কোন হরির খুড়ো আর ওই বা আমাদের কোন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ। সংসারটাই চলছে কেবল এই কথাবার্তার ঘোরপ্যাঁচে, মূলে স্বার্থ ষোল আনা। এলেন অমুক মণ্ডলীর হর্তাকর্তা, দিলেন ধর্ম বক্তৃতার স্রোতে সহরটাকে ভাসিয়ে,—লোকগুলো যেন বাবাজীর নামে ক্ষেপে গেল। ওঃ বাবা—শেষে ইয়া লম্বা চাঁদার খাতা। প্রথমেই হয়ত দেখতে পাবে, মহারাজা টিপারা কি কাশিমবাজারের নামে কমপক্ষে হাজার টাকা,—এ ত গেল রুই কাতলার কথা,—তারপর ছোটখাটো চুনো-পুঁটি যে যেখানে আছেন, তাঁদেরও অনেকেরই নামে একটা অঙ্কের পরে দুটো না হোক অন্ততঃ একটা শূণ্যি বসানো আছেই। একাজে সার্টিফিকেটের বহর বড় কম নয়। মনে কর কি এসব বক্তৃতায় বিশেষ কোন কাজ হয়? যারা বক্তৃতা শোনে, তারা শোনবার সময় বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই শোনে, কিন্তু বল ত দেখি, সেই শ্রদ্ধা ক'জনের তেমনি অটুট থাকে, যখন চাঁদার খাতাটি বেরোয়। তখন যারা বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল, তারাই উল্‌টো গাইতে সুরু করে ছায়। এদিকে বিদগ্ধমণ্ডলীর বাবাজীও চোখ-কান বুজে যা কিছু পেয়ে যান, করেন, এই যথেষ্ট। তাঁরাও হোমিওপ্যাথিক মাদার টিংচারের মতন (গীতা, উপনিষদ ও বৈষ্ণব গ্রন্থের কতকগুলি বাঁধা বুলি মুখস্থ আছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা হলে গীতা, উপনিষৎ—আর ভক্তির কথা হলেই ভাগবতাদি বৈষ্ণব-গ্রন্থ—আর একটুখানি গম্ভীর সুরে যদি তত্ত্বের কথা কওয়া যায়, কিম্বা

একটু রসান দিয়ে গদগদ স্বরে ভক্তির কথাই আবৃত্তি করা যায় ত, মানুষ গলবে না কেন ? অতবড় পাষণ্ড জগাই-মাধাই গলেছিল—রায় রামানন্দ বিষয় বাসনা ছেড়ে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত হতে পেরেছিলেন—ধনীর ছেলে রঘুনাথ দাস দুজন গোস্বামীপাদেরমধ্যে অন্যতম গোস্বামী বলে পরিগণিত হতে পেরেছিলেন, তা আমাদের মতন দু-চারজন অন্ততঃ দু-একদিনের জন্যেও একটুখানি ভক্তির সোঁতায় গা ভাসাতে পারবে না ? আমরাও ত বাংলারই মানুষ,—যে বাংলার ভাবপ্রবণতার তুলনা নেই, যেখানে চণ্ডিদাস, চৈতন্যদেব, প্রভৃতি জন্মে গেছেন। যেখানে ভক্ত রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধনায় বসে মায়ের সাক্ষাৎকার লাভ করে গেছেন,—শুধু তাই নয় এমন সব ভাবের বীজ দেশময় ছড়িয়ে গেছেন, যার ফলও আমরা কম ভোগ করছি না। এঁরাই হলেন আদত মানুষ, এঁরা দেশে দেশে বক্তৃতা করেন নি—চাঁদাও তোলেন নি ! যদিও বা রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্যেরা বক্তৃতাই করেছেন বেশী ও যথেষ্ট চাঁদাও তুলেছেন, সেটা ত স্বোদর পুরণের জন্য নয়। চিকাগো সানফ্রানসিস্কোর অত বড় মঠ গড়েছিল, প্রধানত বক্তৃতারই মাহাত্ম্যে। আজ যে বিশ্বজুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যস্রোত বয়ে চলেছে এ স্রোতের মূলে বক্তৃতা ছিল, কিন্তু এ সব বক্তৃতালব্ধ অর্থ থেকে কত বড় বড় অনুষ্ঠান হয়েছে, তা ত আর কারো অজানা নেই ! তাঁরা কখনও কারো লম্বা সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোন নি, বা বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা-চওড়া চাঁদার খাতাও বের করেন নি। লোকে যা দিয়েছে, তাঁদের সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের সদনুষ্ঠানের ওপরে আস্থাবান হয়ে। এই ত চাই, নইলে যত কিছু সব ব্যবসাদারী। স্বদেশীমার্কা মেরে যেমন স্বদেশী বস্ত্রভাণ্ডার অবাধে বিলিতী কাপড় বেচে ডাহা লোককে ঠকায়, তেমনি আগে ধর্মবক্তৃতা করে পরে যারা নিজেদের উদর-পূরণের জন্য চাঁদার খাতা বের করে, তারাও মনে হয় লোককে ঠকায়। কেননা এসব ব্যাপারে উপার্জিত অর্থ কোন সদনুষ্ঠানেই যথাসম্ভব ব্যয় হওয়া উচিত ! বলব কি ভাই, কেবল ব্যবসা, ব্যবসা, ব্যবসা। লেখক বই লেখেন, তা তিনি যত বড় কবি বা সাহিত্যিকই হোন না কেন, ব্যবসার দিকে তাঁর দৃষ্টি

আদৌ থাকে না, এমন কথা হলপ করে অস্বীকার করলেও আমি মানতে রাজী নই। অবশ্য খুব বড় লেখকের, প্রতিভাশালী লেখকের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা যা প্রতিভার বলে গড়ে তোলেন তাই সমাজ মাথায় তুলে নেয়। সেখানে হয়ত ব্যবসা নেই, কিন্তু সব জায়গায়ই ও কাকারই মতন ব্যবসাদারীর কায়দা।—'

বলিতে বলিতে তিনি স্তব্ধ হইলেন। পথ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। জনবিরল রাস্তার খাদে অবিশ্রান্ত ভেকধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। কিন্তু সকল শব্দকে ছাপাইয়া একটা অবিশ্রান্ত করুণ ধ্বনি কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল, সেটি ঝিল্লীরব।

(সেদিন পথে চলিতে চলিতে শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবনের অনেক কথাই আমাকে বলিলেন—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।) আমিও আর কোন কথা বলিলাম না। নীরবে বিদায় লইয়া আসিলাম।

।। আট ।।

সাহিত্য সভার অধিবেশন বেশ জাঁকাল রকমেরই হইল। শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য যেমন 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীবাবুর অনুরোধ, তেমনি হরিদাসবাবু এবং জলধরবাবুরও অনুরোধ। লেখক তখনকার মত 'শ্যাম রাখি না কূল রাখি' বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং কোন পক্ষেরই অনুরোধ রক্ষা না করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

শরৎবাবু আমাদিগকেও ক্রমাগত উৎসাহ দিতে লাগিলেন, 'ওহে ধৈর্য ধরে লিখতে হয়, তার পরিচয় ত আমার লেখাতেই পেলে; নচেৎ আমার কি বাংলা ভাষায় তোমাদের চাইতে জ্ঞান বেশী?'

উত্তর না দিয়া মনে মনে বলিতাম, তাই নাকি? হাজার চেষ্টা করলেও যে অমন একটি গল্প লিখতে পারব না মশাই!

যেদিন হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছু মোটারকমের টাকা ইন্‌সিওর করিয়া পাঠাইলেন, সেই দিনই আমাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, প্রকৃত গুণের মূল্য মানুষ কখনও দিতে কার্পণ্য করে না।

শরৎবাবুরও লেখার উৎসাহ যেন অতঃপর চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। বন্ধুবান্ধবদের বাসায় তাঁহার গতিবিধি খুবই বিরল ছিল। বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া কদাচিৎ কাহারও বাসায় হয়ত যাইতেন, এক আধ ঘণ্টার জন্য অনুরোধ রক্ষা করিতে। ভাবুক, রসশিল্পী শরৎচন্দ্রের কোথাও গিয়া এ সময়টায় মন টিঁকিত না। বলিতেন, 'কাজ আছে বাসায় চললুম।' বাসায় কাজ তাঁর কিছুই নয়, সাহিত্যরচনা। সময় সময় তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছে, 'রাত্রে লেখার অভ্যাস কোন কালেই ছিল না। এখন বাধ্য হয়ে অনেক রাত অবধিও লিখতে হয়।'

বঙ্কিমবাবু ডেপুটীগিরি করিতেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রকৃষ্ট সময়ই ছিল নিস্তব্ধ রাত্রিতে। শরৎচন্দ্র একথার উল্লেখে বলিতেন, 'ডিকেন্স কিন্তু দিনের বেলায় লিখতেন বলে জানি।'

শরৎচন্দ্র ডিকেন্স-এর ভক্ত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলিতেন, 'দেখ হে! দিনের বেলায় যা লেখা যায়, সেটা যেমন সুন্দর হয়, রাতের লেখা তত সুন্দর হয় না—প্রায়ই সেটা কুৎসিত হয়, এমন কি তাতে ভুলও থাকে বিস্তর। ডিকেন্স দিনের বেলায় লিখতেন বলেই তাঁর লেখা অত সুন্দর—হুবহু দিনের আলোর মত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।'

এ কথার উপর আর কথা নাই—একেবারে বেদবাক্য!

এইরূপ অনেক কথাই তিনি অনেক সময় বলিতেন। আমরাও চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতাম। বাস্তবিকই নানা কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে ইঁহার অশেষ জ্ঞান যেন আপনা হইতেই ফুটিয়া বাহির হইত।

সাহিত্য সভার অধিবেশনের পর শরৎবাবু প্রায়ই বলিতেন, 'আমার আর এখানকার চাকরী একদিনও ভাল লাগছে না।'

ভাল না লাগার প্রধান ও মুখ্য কারণ হইতেছে অফিসের বাঁধা-বাঁধি নিয়মের সঙ্গে স্বাধীন মনোবৃত্তির খাপ না-খাওয়া। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, আর্থিক আকর্ষণ।

এই সময় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও নাকি তাঁহাকে নানারূপ চিঠিপত্র লিখিয়া চাকুরী ছাড়িবার জন্য প্রলুব্ধ করিতেছিলেন। অবশ্য সে সব চিঠি-পত্রের বিষয় প্রায়ই আমাদের জানিবার উপায় ছিল না। কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করিলে, এমন একটা উত্তর পাইতাম যাহাতে আর জানিবার জন্য আর স্পৃহা থাকিত না। সময় সময় বলিতেন, 'চিঠি বাসায় রয়েছে—কালকে এনে দেখাব।'

কন্তু ওই পর্যন্তই। তাঁহারও আনা শেষ, আমারও জানা শেষ। তবে দু-একখানা চিঠিপত্র মাঝে মাঝে খুব গোপনে আমাকে দেখাইতেন আর

সাবধান করিয়া দিতেন, 'ওহে কাউকে বল না কিন্তু—সবাই হয়ত এসব ব্যাপার জানতে পারলে আমার ওপর এতটুকু খুসী হবে না।'

কথাটা বড় মিথ্যা নয়। একটা সামান্য কেরানী, সে কিনা বই লিখে মাস মাস মোটা টাকা পায়, তাও গুরুদাস চাটুয্যের মত অত বড় পাবলিশারের কাছ থেকে—যার কাছে অনেক লেখক পাত্তাই পায় না।

আমি সকল সময় শরৎবাবুর নিষেধাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিতাম না। মনের আবেগে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিতাম। অবশ্য নিজের সম্বন্ধে পরের মুখের প্রশংসায় যে তিনি মনে মনে খুসী হইতেন, একথা বলাই বাহুল্য।

আমাদের উভয়ের অফিসের কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাও বেশ সুষ্ঠুভাবে অতিবাহিত হইতেছিল। এমন সময় শরৎবাবু হঠাৎ কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার 'বিরাজ বৌ'-এর একটা হিন্দী সংস্করণ বাহির হইয়াছিল।

আমাদের হিন্দুস্থানী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পণ্ডিত বিনোদলাল বাংলা জানিতেন। তিনি ঐ বইয়ের বাংলা সংস্করণ পড়িয়া খুসী হইয়াছিলেন। এবারে হিন্দী সংস্করণের কথা শুনিয়া, লেখককে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বোধহয় এইসব প্রশংসাবাক্যেই তাঁহার কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল।

ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে লোক। কাহারও কোন অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করা এ মহাপুরুষের কোষ্ঠীতে কস্মিনকালেও লেখা ছিল না। সুতরাং কলিকাতা না গিয়া তাঁহার চিত্তের আবেগ আর প্রশমিত হইল না।

কিছুদিন পরে যখন নিতান্ত অতর্কিত ভাবে নিষ্ঠুর নিয়তির দারুণ কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া মনে মনে ন্যায়বান জগদীশ্বরের ন্যায়বত্তার প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলাম, জানি না তখন কাহার চিঠিপত্রে আমার দুর্দশার সংবাদ পাইয়া শরৎবাবু আমাকে লিখিলেন, 'জানিতে পারিলাম তোমার স্ত্রী মারা গেছে। বলিবার কিছুই নাই। শুধু ছেলে-মেয়েদের মা বাপ দুইই হয়ে

থেকো, সমাজের কাছে, ধর্মের কাছে, বিবেকের কাছে। আশীর্বাদ করি শান্তি লাভ কর—সুখী হও।'

সপ্তাহ কয়েক পরে আমাকেও তিনটি শিশু লইয়া দেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল।

কলিকাতায় আসিয়া কবি সাহিত্যিক বন্ধু কুমুদনাথ লাহিড়ীকে তল্লাস করিয়া বাহির করিলাম। বহুদিন পরে দেখা। কুমুদনাথ আমাকে পাইয়া যে কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন 'যমুনা' অফিসে। কিন্তু 'যমুনার' কর্ণধার ফণীন্দ্রনাথ পাল অনুপস্থিত। শরৎবাবুও অসুস্থতার দরুণ কয়েক দিন যাবৎ আসেন না। এই 'যমুনা' অফিসেই কবি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়—কবি কুমুদনাথের প্রচেষ্টাতেই। পরে বাসার ঠিকানা জানিয়া লইয়া যেদিন অপরাহ্নে মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটে গিয়া শরৎচন্দ্রের সহিত দেখা করি, সেদিনকার কথা আমার স্মরণ পথে চিরজাগরূক রহিবে।

বাতায়ন পথ হইতে কতকগুলি কৌতূহলী দৃষ্টির আক্রমণ এড়াইয়া যখন বাটীর দ্বারদেশে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলা বড় নাই। শীতের সন্ধ্যা আগত প্রায়। মহাপুরুষ আমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াই, 'ওহে সরকার না কি হে? আরে এসো এসো—কোথায় উঠেছ?' ইত্যাদি প্রশ্নে আমাকে যেরূপ ভাবে বিব্রত করিয়া তুলিলেন তাহা সহজে ভোলার কথা নয়। তারপর, 'ওহে শীগ্‌গির করে চা নিয়ে এসো, খাবার নিয়ে এসো।'

দেখিলাম, মেঝেতে পাতা বিছানার একপাশে দুই-তিনখানা সাদা কাগজের নথি। কি কি নূতন লেখা তখন চলিতেছিল মনে নাই।

আমার দুঃখ কষ্টের কাহিনী সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। সংক্ষেপে মাত্র বাসার খবর লইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে, গেঞ্জির উপর কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়াইয়া আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে রাস্তার অনেকদূর পর্যন্ত আসিলেন। পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম, 'এভাবে রাস্তায়

বেরোলেন, কতজনে আপনাকে হয়ত চেনে, দেখলে কি মনে করবে ?'

'কি আর মনে করবে ? আর কজনেই বা এখানে এ মূর্তির সঙ্গে পরিচিত ?'

'তা পরিচিত না হোক, কিন্তু এ টিঙটিঙে চেহারায় শীতের দিনে এরূপভাবে বাইরে বেড়ালে ঠাণ্ডার সঙ্গে আপনি খুবই পরিচিত হবেন।'

এবারে তিনি গৃহাভিমুখী হইলেন। ইহার পর আমি কলিকাতায় দুই তিন দিন মাত্র ছিলাম।

কিছুকাল পরে আমার কর্মস্থল রেঙ্গুনে ফিরিলাম। শরৎবাবু এবার বলিলেন, 'ওহে, কোলকাতায় থাকতে ইচ্ছা হয় না। দিনরাত কেবল লোকের উপদ্রব। অথচ কোলকাতায় থাকবার জন্যে লোকের পীড়াপীড়ির অন্ত নেই। দেখতে পাচ্ছি চাকুরীও আর পোষাচ্ছে না। এ অবস্থায় কী-ই বা করা যায়, তাও ত বুদ্ধিতে ঠাহর পাচ্ছি নে।'

সেকশনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থেকে সুরু করিয়া বড় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর বার্ণার্ড, এমন কি শেষটায় সেকশনের ইন্‌চার্জ অফিসার পর্যন্ত চ্যাটার্জীর প্রতি বিরক্ত হইয়া গেলেন। চ্যাটার্জীও ক্রমশঃ এমন বেপরোয়া হইয়া উঠিতে লাগিলেন যে, ব্যাপারটা একদিন চরমে উঠিল। দুই পক্ষে লাগিল ঠোকাঠুকি। বাকযুদ্ধে জয়ী হইলেও শরৎচন্দ্র মল্লযুদ্ধে পরাস্ত হইলেন।

সকলেরই মুখে, বিশেষতঃ তামিল-ভাষী মদ্রদেশীয় দ্রাবিড় জাতির মুখে কেবল ওই এক কথা, 'চ্যাটার্জী এবার বার্ণার্ডের বিরুদ্ধে কেস করুক।'

আরে বাপু তোদের কেন এত মাথা ব্যথা ! কথায় বলে, 'আপন মান আপনি র খি—কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি।'

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রতিপক্ষ ফিরিঙ্গী বার্ণার্ড সাহেবের ব্যবহারও মনে পড়ে। সুন্দর চেহারা, সুশিক্ষিত এই সাহেবটির গলার আওয়াজও সচরাচর কেহ শুনিতে পাইত না। পাছে নিজের ব্যবহার অপরের বিরক্তি উৎপাদন করে, এই দিকে সাহেবের লক্ষ্যও ছিল খুব বেশী।

আমি কাহারও চরিত্রের সমালোচনা করিতেছি না, যাহা নিছক সত্য, তাহাই বলিতেছি।

এই প্রসঙ্গের এইখানেই শেষ।

॥ সমাপ্ত